উৎসবের প্রণতি

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, এম, এ, (লণ্ডন) আই, ই, এস

প্রিন্সিপ্যাল, মুরারীচাঁদ কলেজ, শ্রীহট্ট,

প্রণীত।

১১ই মাঘ, ১৩৪৭ বাং।

মূল্য ।০ আনা।

প্রকাশক—
পণ্ডিত শ্রীসুবোধচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, বি. এ।
শান্তি কুটীর, শিলং।

গ্রন্থকারের লিখিত পুস্তকগুলির নাম ও মূল্য :—

১।	ছেলেমেয়েদের প্রার্থনা	।০
২।	জীবনবীণার বিচিত্রসুর (১ম খণ্ড)	।০
৩।	উৎসবের প্রণতি (১ম খণ্ড)	।৵০
	” ” (২য় খণ্ড)	॥০
৪।	উপনিষদের মর্ম্মবাণী (যন্ত্রস্থ)	
	(১ম খণ্ড) (ঈশা ও কেন)	।০
	” ” (২য় খণ্ড) (কঠ)	।৵০
৫।	নবযুগের শিক্ষা ও সাধনা (যন্ত্রস্থ)	৵০
৬।	Religion and Modern India	২॥০

প্রাপ্তিস্থান :—(১) গ্রন্থকারের নিকট, মুরারিচাঁদ কলেজ, শ্রীহট্ট।
(২) শ্রীআশীষকুমার রায়, শান্তি-কুটীর, শিলং।

প্রিণ্টার—
শ্রীযতীশ চন্দ্র দত্ত
ইউনিভার্স্যাল প্রেস, ঢাকা।

ভূমিকা

উৎসবের প্রণতি প্রথম খণ্ডে লেখকের ছাত্রজীবনে (লণ্ডন প্রবাস কালীন) মাঘোৎসব ও অন্যান্য শুভদিন উপলক্ষে যে সকল প্রার্থনা, আরাধনা বা আত্মচিন্তা লিপিবদ্ধ করা হইত তাহার সঞ্চয়ন প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ডে ছাত্রজীবন হইতে কর্ম্মজীবনের ১৯৩৩ ইং সন পর্য্যন্ত উৎসবের অনুভূতি ও আধ্যাত্মিক চিন্তা বিবৃত হইয়াছে। এই পুস্তকের দুই খণ্ডেরই বিষয়গুলি অসাম্প্রদায়িক ভাবে সকল ধর্ম্মের সাধকদের জন্যই উদ্দিষ্ট। তবু যদি স্থানে স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের উল্লেখ আছে বলিয়া কেহ সাম্প্রদায়িক ভাবে লেখাগুলি গ্রহণ করেন, তবে এইটুকু মনে রাখিলেই চলিবে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতে এখানে কোন নূতন ধর্ম্মবিধানের বা সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। সকল ধর্ম্মের মধ্যে যাহা সনাতন ও বিশ্বজনীন সত্য তাহাকেই ব্রহ্মের অর্থাৎ পরমেশ্বরের, পরমাত্মার (অথবা জিহোবা, গড্, খোদা, আল্লা ইত্যাদি যে কোন নামে সেই পরম দেবতার পরিচয় দেওয়া হউক না কেন) উপাসনামূলক ধর্ম্ম বা ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এরূপ ধর্ম্মকে যাহারা আদর্শ বলিয়া মানেন ও জীবনে আচরণ করেন, তাহারাই ব্রাহ্ম এবং তাহাদের সমাজই ব্রাহ্মসমাজ। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সকলেই এই সংজ্ঞাভূক্ত হইতে পারেন।

এই পুস্তকের কোন কোন অংশ তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীমান সুশীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই পুস্তকের মুদ্রণে সাহায্য করিয়া আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।

১১ই মাঘ,
১৩৪৭ বাং সন

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

প্রকাশকের নিবেদন

ধর্ম্মসাধনে ও সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার মানসে শিক্ষকতা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গ্রন্থকার মহাশয়ের সহিত শ্রীহট্টে অবস্থানকালে পবিত্র মাঘোৎসবের অন্তর্মুখীন ও চিত্তশুদ্ধিকর হাওয়ায় পরিপুষ্ট, গভীর আত্মানুশীলনমূলক এবং ব্রহ্মোপসনায় মগ্ন ভক্তের প্রত্যক্ষ অনুভূতিমূলক তাঁহার দৈনিকী আমার সংগ্রামময় জীবনকে চিরনূতন অথচ চিরপুরাতন স্বর্গীয় ধারাজলে স্নান ও সঞ্জীবিত করিয়া পারমার্থিক উন্নততর আকাঙ্ক্ষার অনুপ্রাণনা জাগাইয়াছে। বিধাতার অপার কৃপায় আমার কিয়দ্দিবস পোষিত কল্পনামুকুল শুভলগ্নে "উৎসবের প্রণতি"—ফুলে ফুটিবার মাঙ্গলিক যোগ আসন্ন দেখিয়া তাঁহার চরণে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

গ্রন্থকার মহাশয়ের শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইবে যদি ধর্ম্মপিপাসু নরনারী জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানা ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত পাঠ করতঃ ধর্ম্মের উন্নতিশীল দার্শনিক ভিত্তি এবং উপাসনার স্বর্গীয় মাধুর্য্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনুভূতির সঙ্গে ব্রহ্ম-নাম-সুধা-সাগরে ডুবিয়া বিষয়-সন্তপ্ত প্রাণে শান্তি বারি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

শ্রীহট্ট,
২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

শ্রীসুবোধচন্দ্র বিত্তালঙ্কার।

উৎসবের প্রণতি

উৎসর্গপত্র

পূজনীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় সূর্য্যমণি রায়

মহাশয়ের শ্রীচরণ কমলে।

পিতা,

তুমিই আমার স্বর্গ, তুমিই আমার ধর্ম্ম, তুমিই আমার পরম তপস্যা। তোমার প্রীতি সাধন করিলে সর্ব্ব দেবতা প্রীতি লাভ করেন। তোমার বহু পুণ্যের অর্জ্জিত সাধনা আমার ধমনীর শোণিতে প্রবাহিত। উৎসব উপলক্ষে পরম দেবতার করুণা ও প্রেরণা রূপে যে পবিত্র ভাবধারা হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়াছে তাহা তোমারই চরণে সমর্পণ করি।

শ্রীহট্ট,
মুরারিচাঁদ কলেজ,
২৯।৮।৪০ইং

তোমার অযোগ্য পুত্র
ভক্তিপ্রণত—
সতীশ।

উৎসবের প্রণতি

দ্বিতীয় খণ্ড।

মাঘোৎসবের সম্ভাষণ

(লণ্ডন হইতে ১৯১২ ইং সনে)

সাত সমুদ্র তের নদীর পারে সুদূর প্রবাসে থাকিয়াও পরম পিতার পুণ্যোৎসবের মধুর আহ্বান শুনিতেছি। সেই অতীন্দ্রিয় দেবতা দেশ কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া মাঘমাসের মহাপর্ব্বদিনে ইহকালের ও পরকালের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের সকল ব্রাহ্ম নরনারীকে তাঁহার পবিত্র চরণে সম্মিলিত করিবেন। সেই মহামেলার তীর্থযাত্রিগণ অনেক দিন হইতেই সম্বৎসরের সঞ্চিত সকল সম্পত্তি আত্মার পুঁটুলিতে বাঁধিয়া ব্রহ্মমন্দিরে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের দর্শনলাভ করিবার জন্য প্রস্তুত

হইতেছেন। যাঁহার যেরূপ শক্তি সামর্থ্য, যাঁহার যেটুকু শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট, যাঁহার যাহা প্রীতিকর ও মনোহর, তিনি তাহাই বিশ্বরাজের সম্মুখে নিবেদন করিবার জন্য লইয়া আসিতেছেন। তাঁহার বিশ্বের সভায় প্রবেশ করিবার দ্বার সকলের জন্যই মুক্ত; সাধু পাপী, ধনী নির্ধন, বিদ্বান, মূর্খ, উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে সকলের জন্যই সেখানে স্থান আছে। যিনি কবি তিনি সুললিত কাব্য দিয়া, যিনি শিল্পী তিনি সূক্ষ্ম সুন্দর কারুকার্য্য দিয়া, যিনি জ্ঞানী তিনি সুসজ্জিত চিন্তা দিয়া, যিনি গায়ক তিনি সুমধুর সঙ্গীত দিয়া, যিনি বক্তা তিনি প্রাণস্পর্শী ভাষা দিয়া, যিনি ভাবুক তিনি চিত্তহারী সরল ভাব দিয়া এই উৎসবের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিবেন। যাহারা শোকে তাপে, রোগে দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত তাঁহারা আপনাদের চিত্তের নিবিড় ঘন অন্ধকারকে জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রসন্ন হাস্যের আলোকে দীপ্ত করিয়া, যাঁহারা পাপের সহিত প্রলোভনের সহিত সংগ্রামে পরাজিত পরিশ্রান্ত হইয়া লজ্জায় অবনত ও পরিতাপে ম্রিয়মাণ, তাহারাও আপনাদের চিরপোষিত নিরাশার কৃষ্ণ মেঘরাশিকে নূতন আশা, নূতন উৎসাহ ও নূতন সংকল্পের স্বর্ণকিরণে মণ্ডিত করিয়া এই মঙ্গল অনুষ্ঠানের শোভা ও সার্থকতা বৃদ্ধি করিবেন। কারণ এই শুভদিনে প্রেমপিয়াসীদের জন্য শীতল বিমল ভগবত-করুণারস মধুধারা প্রবাহিত হইবে; অকাতরে, অজস্র ধারে পৃথিবীর সকল দুঃখ, দৈন্য, পাপ, লজ্জা, ভয়, নিরাশা, সন্দেহ, অবিশ্বাস স্রোতোমুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। তাই

কবি বৎসরের মধ্যে কেবল একটি দিনকে পূত করিয়া, ধন্য করিয়া অমর ভাষায় গাহিয়াছেন ;—

"শূন্য হৃদয় লয়ে, নিরাশার পথ চেয়ে,
বরষ কাহার কাটিয়াছে ?
এসগো কাঙ্গাল জন, আজি তব নিমন্ত্রণ,
জগতের জননীর কাছে।
কার অতি দীন হীন বিরস বদন ?
(ওগো) ধুলায় ধুসর মলিন বসন ?
দুঃখী যেবা আছ, শুন গো বারতা,
ডেকেছেন তোমারে জগতের মাতা।"

আজ আমাদের আনন্দের দিন, কারণ আজ মায়ের শিশু সন্তানগণ মায়ের কোলে মিলিত হইব। এই উৎসবে যেন প্রত্যেক ব্রাহ্ম নরনারী সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন করিয়া ধন্য হন এবং উৎসবান্তে সকলকে ডাকিয়া বলেন—

"শোন বিশ্বজন,
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসি ! আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি, আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁরি পানে চাহি
মৃত্যুকে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।"

ইহাইত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব যে, এখানে কোন মধ্যবর্ত্তী, কোন তৃতীয় পুরুষের সাহায্যে ও অন্তরালে নয় কিন্তু প্রত্যক্ষ

ভাবে প্রত্যেকে আপনার অন্তরে ও বাহিরে অনন্ত দেবতাকে বোধের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারেন ও সংসারের মৃত্যুর অন্ধকার অতিক্রম করিতে পারেন। এই ধর্ম্ম এমন কিছু কঠোর সাধন নয়, এমন কিছু নূতন আবিষ্কার নয়, ইহা হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও মহম্মদীয় ধর্ম্মেরই অন্তর্নিহিত বীজগুলির বিকাশ ও পূর্ণতামাত্র। এই ব্রাহ্মধর্ম্মে আজ পর্য্যন্ত জগতে যত ধর্ম্ম-বিধান প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদেরই চরম পরিণতি, সফলতা ও পরিসমাপ্তি। আজ হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, সকল সমাজের ভাই ভগিনীকে ডাকিয়া বলিতে হইবে,—"আমরা সকলকেই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছি, কাহাকেও বর্জ্জন করি নাই। বেদ, ত্রিপিটক, বাইবেল, কোরাণ সকল শাস্ত্রেই আমরা ঈশ্বর প্রকাশিত সত্য আছে বলিয়া মানি; বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ চৈতন্য সকলকেই মহাপুরুষ ও আমাদের গুরু বলিয়া স্বীকার করি। এস ভাই বোন! তোমাদের যাহার যেমন রুচি, বিশ্বাস, অধিকার, সেরূপ সাধনা, সেরূপ শাস্ত্র ও গুরু অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার শীতল ছায়ায় সকল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভূলিয়া শান্তি লাভ কর।"

সত্য সত্যই কি ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে বিশ্বজনীন ধর্ম্মের আদর্শ ও সাধনা শিক্ষা দেন নাই? আমাদের শাস্ত্র কি সকল দেশের সকল যুগের অবিনাশী সত্য নয়? সত্য যাহা, নিত্য যাহা, তাহা কি ভগবানের সাক্ষাৎ প্রকাশ নয়? আমাদের আচার্য্য, শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা কবি প্রাকৃতিক জগৎ,

মানবসমাজ বা নৈতিক জীবন সম্বন্ধে যাহা কিছু সত্য লাভ করেন তাহা কি মঙ্গলময় স্বপ্রকাশ দেবতার অনুপ্রাণনা বলিয়া স্বীকার করেন না? দুর্ব্বল, অজ্ঞ, মরণশীল মানুষ কোন্ সাহসে কোন্ প্রমাণে সার্ব্বভৌমিক ও সনাতন সত্য প্রচার করিতে পারে যদি তাহা অনন্ত দেবতার প্রত্যক্ষ প্রকাশ না হয়? যেমন বর্ত্তমান কালের জীবন্ত প্রচারকগণ, তেমনি অতীত যুগের মহাপুরুষগণ, মুসা, ঈশা, মহম্মদ, সেই একই মূল উৎস হইতে সত্য, প্রেম ও মঙ্গলের ধারা সাংসারিক জীবের নিকট প্রবাহিত করেন। যাহা ভ্রান্ত, যাহা অনিত্য, তাহা কেবল দ্রষ্টা ও শ্রোতাগণের মৃণ্ময়পাত্র-সংস্পর্শজাত, তাহা বিশ্বজনীন সনাতন ধর্ম্মকে মলিন করিতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজ যেমন ধর্ম্মপ্রবাহের স্বর্গীয় ও চিরন্তন মূলের সহিত যোগ রাখিয়া পুরাতন বিধানগুলির ঐশ্বরিক প্রকাশ স্বীকার করেন, তেমনি প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক জাতির বিশেষ স্মৃতি ও মানবীয় ভ্রান্তির ঘোলাজল হইতে ধর্ম্মস্রোতকে পবিত্র রাখিবার জন্য মানবাত্মার চিন্তা, জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি ও ধ্যানযোগের শোধনযন্ত্রকে চিরকাল সজ্ঞান ও কর্ম্মশীল রাখিয়াছেন। যেমন ঈশ্বরপ্রকাশিত শাস্ত্রবাদের মধ্যে তেমনি ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ বা অবতারবাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সারসত্য গ্রহণ করিয়া সার্ব্বভৌমিকতার দাবী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। অনন্ত যে মানুষের কাছে সান্তের মধ্যে ধরা দেন, আনন্দ যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ও মানবসমাজের প্রেমে অভিব্যক্ত হন, একথা সকল ধর্ম্মেরই প্রাণ। যীশুর মস্তকে স্বর্গ হইতে

পরমাত্মা কপোতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে ; কিন্তু পৃথিবীর সকল সাধুভক্তের জীবনেই কি সেই সত্যস্বরূপ জ্ঞানের, প্রেমের, ভক্তির অনুপ্রাণনারূপে, মঙ্গল কর্ম্মে শুভ বুদ্ধির প্রেরণারূপে প্রত্যেক সমাজে অবতীর্ণ হন নাই ? ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য বা যীশু, মহম্মদকে ভগবানের অবতার স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন, কিন্তু যাঁহার আত্মাতে যতটুকু সেই অনন্ত দেবের প্রকাশ তাঁহাতে সেই পরিমাণে ঈশ্বর অভিব্যক্ত হইতেছেন। এই হিসাবে মহাত্মা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পরমহংস রামকৃষ্ণ, সরস্বতী দয়ানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ একই পূর্ণব্রহ্মের অংশাবতার ইহাতে আর সন্দেহ কি ? ইঁহাদের সকলেই অনন্তের এক এক দিক্ আপনাদের জীবনে ও শিক্ষায় প্রতিফলিত করিয়াছেন ; একজনকে ছাড়িয়া অন্যজনকে পূর্ণ প্রকাশরূপে গ্রহণ করাতেই যত সংকীর্ণতা, বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম আরও আশার কথা, আরও উৎসাহের কথা শুনাইতেছেন,—প্রত্যেক মানুষের আত্মাতে ভগবান্ অবতীর্ণ হইতেছেন, ও তুমি আমি সকলেই আমাদের রক্ত মাংসের শরীর লইয়া ইহজীবনেই অনন্তের প্রতিবিম্ব বা অবতার হইতে পারি, যদি আমরা তাহার উপযুক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত হই। তিনি ত আমাদের হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আমাদের জীবনে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন ! নিয়তই প্রতীক্ষা করিতেছেন আমরা

যাহাতে ব্যবধান ভাঙ্গিয়া দেই, মোহ আবরণ সরাইয়া ফেলি ও পবিত্র হৃদয়ে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকেই আমাদের সত্য আত্মা, নিত্য আত্মা, পরম আত্মারূপে বরণ করিয়া লই। বস্তুতঃ আমাদের যে ব্যক্তিত্বের গৌরব, "আমি" বলিয়া যে জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্যটুকু, তাহার কেবল এই একমাত্র প্রয়োজন ও সার্থকতা যে, আমরা স্বাধীন ভাবে চিরকালের জন্য সেই অমর আত্মার চরণে দাসত্বে বন্দী হইয়া প্রকৃত মুক্তির পরম আনন্দের আস্বাদ লাভ করিব। এইখানেই অদ্বৈতবাদীর সহিত দ্বৈতবাদীর শুভ পরিণয়। আমরা সংসারের জীবনে যে পরিমাণে মরিতে পারি, নিজের স্বার্থমুখীন আত্মাকে যে পরিমাণে বলি দিতে পারি, সেই পরিমাণেই "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিবার অধিকারী হই, সেই পরিমাণেই আমাদের জীবনে অনন্তের প্রকাশ বা অবতরণ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হয়, সেই পরিমাণেই সাধক ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান।

আমাদের দেশের এই দুর্দ্দিনে, এই ভীরুতা, কাপুরুষতা ও দুর্ব্বলতার দিনে, এই রাজ-ভয়, মৃত্যু-ভয়, লোক-ভয়-পীড়িত দাসত্বের দিনে আজ ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাড়া কোন্ অনুষ্ঠান আছে যাহা ভারতের নরনারীর নিকট আত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্য ঘোষণা করিয়া স্বাধীনতার পবিত্র হাওয়া প্রবাহিত করিতে পারে? ব্রাহ্ম-সমাজই সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মের, নীতির, সমাজবিধানের রাজ্যে আত্মার বন্ধন খুলিয়া রাজ-

নৈতিক স্বাধীনতা লাভের পথ প্রস্তুত করেন। আজও ব্রাহ্মধর্ম্ম এই আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আগে মানবাত্মার সত্য পরিচয়—আত্মায় পরমাত্মার প্রকাশ ঘোষণা করিবেন, তারপর আত্মা যখন ধর্ম্মজগতে স্বাধীন হইবে তখন সংসারের আর সকল বিভাগে—গৃহে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে—সেই আধ্যাত্মিক আলোকেই সংস্কার ও পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য বা স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে বিশ্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক হইতে চান, এজন্যই আমাদের কোন বিশেষ শাস্ত্র, অবতার বা তত্ত্ববিজ্ঞান নাই, অথচ সকল শ্রেণীস্থ অধিকারীর জন্যই এখানে ধর্ম্মসাধনের ব্যবস্থা আছে। যাহারা জ্ঞানের আলোকে আপনার আত্মাতে অনন্তের অভিব্যক্তি দেখিতে অসমর্থ, তাহাদের জন্য বাহিরের প্রকৃতির সৌন্দর্য্যভাণ্ডার অবারিত রহিয়াছে, ভক্তিযোগের, কর্ম্মমার্গের প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত আছে। কে তুমি পৌত্তলিক! কাষ্ঠ প্রস্তরের বিকটাকৃতি জড়মূর্ত্তি গঠন করিয়া অন্ধকার ঘরে চক্ষু মুদিয়া মনঃকল্পিত শূন্য দেবতার পূজা করিতেছ? একবার আমার সঙ্গে বাহিরে এস ভাই, চক্ষু খুলিয়া দেখ প্রেমময়ের কি বিচিত্র উৎসব সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। যদি চন্দ্র-তারকার নৃত্যগীতসমন্বিত আরতি, বৃক্ষলতার ভক্তিঅশ্রুস্নাত পুষ্পাঞ্জলি তোমার নীরস হৃদয়ে কবিত্বের ঝরণা না ছুটায়

তবে একবার নিজের ঘরের কোণে ঘোমটার আবরণে যে সৌন্দর্য্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে, যে প্রেম সেবারূপে চিরকল্যাণময়ী প্রার্থনারূপে নীরবে প্রতিদিন তোমাকে পুষ্ট করিতেছে, সেই দেবতার পূজা করিয়া ধন্য হও। তোমার কি এক অন্ধ বিশ্বাস,—কেমন এক চিরাগত সংস্কার ও অভ্যস্ত ক্রিয়াতে আসক্তি আছে তাই তুমি কেবল শ্রীকৃষ্ণের বালগোপাল মূর্ত্তি দেখিয়া অথবা যীশুকোলে মাতা ম্যারীর চিত্র দেখিয়া ভাবে গদগদ হইতেছ, অথচ তোমার ঘরে কতবার কৃষ্ণ ও খৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়া কত লীলার অভিনয় করিতেছেন, তাহা তুমি চক্ষু থাকিতেও দেখ না!

আজ ব্রাহ্মসমাজ ভারতের কোটি কোটি হিন্দু নরনারীকে ডাকিয়া বলুন,—"আমরা সেই সত্য পরমেশ্বরকে সংসারের গৃহে পরিবারে সত্য করিয়া দেখিয়াছি; যে কেহ আপনার পিতামাতা, পুত্রকন্যা, ভাইভগিনী, আত্মীয় বন্ধুকে যথার্থ প্রেমের সহিত সেবা করিয়াছে সেই যথার্থ ভক্ত, তাহার পূজাই দেবতার নিকট গ্রহণীয়। প্রতিবেশীর গৃহে নবজাত শিশু দুগ্ধাভাবে মারা যাইতেছে, কত শত শত দুর্ভিক্ষ-পীড়িতা জননী অর্থাভাবে অন্নাভাবে শিশুরূপী ভগবানের অবতারগণকে মৃত্যুর হাতে সঁপিয়া দিতেছেন, আর দেশের ধর্ম্মাচার্য্যগণ জন্মাষ্টমী, ঝুলনযাত্রা, অন্নপূর্ণা পূজা, দোল ও রাসযাত্রা ধুমধামের সহিত সম্পাদন করিয়া পরকালের পথ প্রস্তুত করিতেছেন! হা ধিক! কে তুমি ভক্তির উচ্ছ্বাসে

ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছ? অথচ ভগবানের শ্রেষ্ঠতম, নিকটতম ও প্রেমিকতম প্রকাশ যে জননী, ভগিনী ও ভার্য্যা তাঁহাদের সহিত ব্যবহারে কর্কশতা, অত্যাচার ও অবিচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছ? আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি, যে মানুষ অন্য কোন মানুষকে নিঃস্বার্থ ভাবে, ব্যাকুলভাবে সরল অন্তঃকরণে প্রাণ মন আত্মা দিয়া ভালবাসিতে পারিয়াছে, সে ভক্তিমার্গেরই পথিক,—কারণ সেই অনন্ত দেবতাই কি পিতারূপে, মাতারূপে, বন্ধুরূপে, সখারূপে, স্ত্রীরূপে, সখীরূপে, আমাদের নিকট মর্ত্ত্য দেহে প্রকাশিত হইতেছেন না? হায়! পৌত্তলিক, তুমি জান না,—ভালবাসা কিরূপে রক্ত মাংসের শরীরকে স্বর্গীয় অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার করে; ভালবাসা কিরূপে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দেবতার অধিষ্ঠান দেখিতে পারে ও প্রিয়তমের জীবনে নিত্য নূতন প্রেমানন্দের বিচিত্র রস আস্বাদন করিয়া, প্রিয়তমের আলিঙ্গনে ভগবানের পবিত্র স্পর্শ লাভ করিয়া, প্রিয়জনের সেবায় ভগবৎপূজার উপযোগী আত্মোৎসর্গ করিয়া এই সংসারেই স্বর্গলাভ করে। যে হতভাগা গৃহে পরিবারে দেবতার উপাসনা করিতে পারিল না, তাহার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধুভক্তি ও মহাপুরুষের জীবন অনুসরণ ব্যবস্থা করিতেছেন। তুমি যদি গীতার অমৃতময় উপদেশে, ঈশার সরল ঈশ্বরপরায়ণতায় অথবা পরমহংস রামকৃষ্ণের ভক্তি-উন্মাদনায় পরমাত্মা লাভের উপায় পাইয়া থাক, তবে তুমি তাঁহাদের সাহায্যে অনন্তের ধ্যান কর।

আর ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতের ধর্ম্ম সাধনার যতগুলি মার্গ ও যতরূপ ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান আপনার কলেবরে গ্রহণ করিয়া সাময়িক প্রয়োজন অনুসারে সংস্কারানন্তর পুনঃ প্রতিষ্ঠা করুন। প্রাচীন বিধান সকলের মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট, বেদ উপনিষদ্‌ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রে, বাইবেল, কোরাণ ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে যেখানে যেটুকু সত্য ও শুভ তাহা পরিপাক করিয়া আপনার জীবনীশক্তির অব্যর্থ প্রমাণ দিন। আসুক আবার আমাদের আশ্রম চতুষ্টয়, ছাত্র-জীবন, গার্হস্থ্য জীবন, স্বদেশ জীবন ও অধ্যাত্ম জীবন—এই চারি স্তরে প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা আপনার জীবন বিভক্ত করুন; আসুক সেইরূপ সন্ন্যাসী ও ভিক্ষু সম্প্রদায় যাঁহারা সুখ-স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দেশের সেবায়, ধর্ম্ম প্রচারে ও শিক্ষা বিস্তারে জীবন উৎসর্গ করিবেন। আসুন আবার মৈত্রেয়ী, গার্গী, খনা ও লীলাবতী, নারীগৌরবে ভারত আবার গৌরবান্বিত হউক। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুশাসন।

তুমি জ্ঞানময় সত্য দেবতা।

১৫ই জানুয়ারী, সোমবার, ১৯১২। ১লা মাঘ।

তুমি সত্য আর যাহা কিছু তোমাকে আশ্রয় করিয়া তোমার সত্তায় সত্তাবান। আকাশ পূর্ণ করিয়া তুমি সত্য,

জড়-জীব-নরে তুমি সত্য, অণুতে এবং পরমাণুতে তুমি সত্য। জল বায়ু মাটি সকলের মধ্যে তোমার শক্তি কাজ করিতেছে। যেমন বাহির তেমনি ভিতর, যেমন প্রকৃতি তেমনি মানব-সমাজ, যেমন ইহলোক তেমনি পরলোক তোমারি সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি প্রতিদিনের অন্নজলে, আলোকে, বাতাসে, কর্ম্মে, বিশ্রামে, ভালবাসায় ও আনন্দে এত অফুরন্ত ভাবে এত নিকটের হইয়া আমাদের কাছে আসিতেছ যে আমরা তোমাকে ভুলিয়াই থাকি। কত স্বাদ, কত গন্ধ, কত গান, কত বর্ণ প্রতিদিন আমাদের আত্মার নিকট তোমার বার্ত্তা লইয়া আসিতেছে,—আমরা অন্ধ হইয়া তোমাকে সম্ভোগ করি অথচ দেখি না। তোমারি জ্ঞানে আমাদের জন্ম, তোমারি প্রেমে আমাদের লালন পালন, তোমারি পুণ্যে আমাদের বৃদ্ধি এবং তোমারি মঙ্গল ভাবে আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি। তুমি জ্ঞানময় দেবতা, অনন্তজ্ঞানে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে সৃজন করিয়াছ, অনন্ত জ্ঞানে ইহার প্রতিঅংশের নিয়ম ও কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছ, অনন্ত জ্ঞানে ইহাকে নানা বিচিত্রতার ভিতর দিয়া পরিপূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছ। কোটি কোটি সৌরজগৎকে কি কৌশলে নির্দ্দিষ্ট পথে চালাইতেছ, গ্রহ নক্ষত্রের পরস্পর আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলে কিরূপে পৃথিবীতে আলোক অন্ধকার, জোয়ার ভাঁটা ও শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু-পর্য্যায় ও জল-বায়ুর বিচিত্রতা বিধান করিতেছ, আমরা তাহার কিছুই বুঝি না। দূরবীক্ষণের

সাহায্যে যে সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে ক্ষুদ্র জোনাকীপোকার মত দেখা যায়, যে সকল নক্ষত্রের আলো এখনও আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছে নাই, এমন সকল গ্রহ-নক্ষত্র লইয়া তুমি অনন্ত আকাশে খেলা করিতেছ, আবার এই মর্ত্ত্য পৃথিবীতে যত জীবজন্তু, যত জড়পরমাণু, তাহাদের ক্রিয়াও তুমি দেখিতেছ, নিয়মিত করিতেছ। অণুবীক্ষণের সাহায্যে যাহাদের অস্তিত্ব জানা যায় এমন অসংখ্য কীটাণুকীটের ক্ষুদ্র দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, রক্তচালনা ও খাদ্যপরিপাক তুমি চালাইতেছ।

তুমি অনন্ত, অগম্য, অপার।

১৬ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার, ১৯১২। ২রা মাঘ।

অনন্ত তোমার জ্ঞান, অনন্ত তোমার প্রেম। যখন মানুষ পৃথিবীতে আসে নাই, যখন জীবজন্তু এখানকার মাটিতে জন্মে নাই, তখনও তুমি ছিলে। কোন্ অতীতের অন্ধকারে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সৃজনের প্রবাহে ছাড়িয়া দিলে, কত কোটি কোটি যুগের ভিতর দিয়া এই জল-স্থল-বায়ুময় জগৎকে বিকাশ করিলে, আবার কোন্ কল্পনাতীত ভবিষ্যতে এই লীলার অবসান হইবে, ভাবিতে চিন্তা পরাস্ত হইয়া যায়। তোমার অনন্ত মহিমার কথা আমরা এক মুখে কত প্রকাশ করিব? মানবসমাজের শৈশব হইতে কত ধর্ম্মানুষ্ঠান, কত শাস্ত্র, কত মহাপুরুষ তোমাকে পূজা করিতেছে, কত ঋষি, কত যোগী, কত বৈজ্ঞানিক, কত দার্শনিক, কত কবি, কত চিত্রকর, কত শিল্পী, কত গায়ক, কত ঐতিহাসিক,

কত উপন্যাসিক তোমার বিচিত্ররূপ, বিচিত্র খেলাকে ভাষার শব্দে ও মর্ত্ত্য উপাদানে অভিব্যক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তুমি যেমন অগম্য, অপার, তেমনি রহিয়া গেলে। মানুষের জ্ঞানের সীমা যত বাড়ে ততই নিজের অজ্ঞতা ও অক্ষমতাই প্রকাশ পায়, তুমি ততই গভীর হইতে থাক।

তোমার রহস্য নির্ণয় করিতে পারি, তোমার সৃষ্টি কৌশলের মর্ম্মভেদ করিতে পারি আমাদের এমন কি সাধ্য! তুমি আপনার প্রেমে একটুখানি জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাইয়া আপনাকে অন্তরে প্রকাশ কর, তাই একটু তোমাকে জানি। আমাদের চক্ষু তোমার দিব্য আলোকেই দেখিতে পায়, আমাদের কর্ণ তোমার বায়ুর আন্দোলনে শুনিতে পায়, আমাদের হস্তপদ তোমার স্নায়ু-মণ্ডলীর সাহায্যেই সঞ্চালিত হয়, আমাদের জিহ্বা তোমার ভাব ও তোমার বাক্‌যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়াই ভাষার বিকাশ করে। তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের অন্তরে পরম চৈতন্যরূপে থাকিয়া ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া সম্পাদন করাইতেছ। তোমার শক্তি না হইলে এক মুহূর্ত্তও আমরা বাঁচিতে পারি না। অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ চলে যায়, বোবা গীত গায়, বধির শুনে—তোমার দয়ায় অসম্ভব সম্ভব হয়, ইহাত মুখের কথা নয়, কবির কল্পনা নয়—এ যে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের জীবনে সত্য হইতেছে। তুমি আছ বলিয়াইত আমরা দেখিতেছি, শুনিতেছি, চলিতেছি ও বলিতেছি। প্রাণ, মন, চৈতন্য—সকল ব্যাপিয়া তুমি একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য দেবতা।

তুমি প্রেমময় পিতা।

১৭ই জানুয়ারী, বুধবার, ১৯১২। ৩রা মাঘ।

সংসারের সকল চঞ্চলতা ও নশ্বরতার মধ্যে তুমি একমাত্র চিরস্থির, অবিনাশী। এখানে কত পর্ব্বত সমুদ্রের গর্ভে লয় পাইতেছে, কত সমুদ্রের বক্ষ ভেদ করিয়া উচ্চ পাহাড় মস্তক তুলিতেছে ; যেখানে অরণ্য ছিল সেখানে নগর বসিতেছে ; যেখানে রাজধানীর কোলাহল ছিল সেখানে শ্মশানের নীরব গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতেছে ; কত স্বর্গতুল্য পরিবারে নরকের ছায়া পড়িতেছে, কত উৎসবের মঙ্গলধ্বনি প্রিয়-বিয়োগের করুণ বিলাপে পরিণত হইতেছে ; কত দুঃখ শোক, পাপ তাপ, রোগ বিপদ, মহামারী, বন্যা, ভূমিকম্প মানবসমাজকে প্রপীড়িত করিতেছে, এখানে শান্তির আশা কোথায় ? তোমার অসীমের মধ্যে যখন আমাদের মন ডুবাইয়া দেই, তোমার মঙ্গল ইচ্ছার সঙ্গে যখন আমাদের ইচ্ছা মিলাইয়া লই, তখনই আমরা সকল অবস্থার পরিবর্ত্তনের মধ্যে শান্তি ও আনন্দ লাভ করি। তুমি সকল ঘটনার মূলে জ্ঞানরূপে, শক্তিরূপে, মঙ্গলরূপে রহিয়াছ ইহা যখন দেখিতে পাই, তখন আমরা আশা ও বিশ্বাসে অটল থাকিয়া তোমার প্রদত্ত জীবনকে তোমার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যে নিয়োগ করি। তুমি অনন্ত জ্ঞানময়, শক্তিময়, তাহাতে আমরা তোমার নিকট আসিতে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতাম—তোমার জ্ঞানের জ্যোতিতে আমাদের চক্ষু

ঝলসিয়া যাইত, তোমার শক্তির উগ্রতা আমাদের মনের শান্তি হরণ করিত। কিন্তু তুমি যে আমাদের প্রেমময় পিতা, আমরা যে তোমার সন্তান। আমরা যতই কেন অজ্ঞ, যতই কেন অশক্ত হই না, তোমার কাছে আমাদের ও যাইবার অধিকার আছে। তুমি আপনার প্রেমে আমাদের নিকট ধরা দাও, আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দাও, যাহাতে তোমার সেবা করিতে পারি এজন্য তুমিই আমাদের প্রাণে বল দাও। তুমি যেমন ভালবাসিতে পার এমন আর কে পারে? সংসারের মাতাপিতা বরং আমাদের অত্যাচার ও অপরাধ দেখিলে কুপিত হন, আমাদের তিরস্কার করেন, কিন্তু তোমার নিকট আমরা কত অপরাধী, কতরূপে কতভাবে তোমার নিয়ম লঙ্ঘন করি,—অথচ তুমি চিরক্ষমাশীল, চিরসহিষ্ণু, আমাদের সকল দোষ ত্রুটি ভুলিয়া আমাদের সহিত প্রেমের খেলা খেলিতেছ, আমাদের মঙ্গলের জন্য কত চেষ্টা করিতেছ।

আনন্দরূপে অমৃতরূপে তুমি প্রাণে প্রকাশিত।

১৮ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার, ১৯১২। ৪ঠা মাঘ।

আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকৃতিতে ও মানবসমাজে আপনাকে ঢালিয়া দিতেছ, আনন্দরূপে অমৃতরূপে আমাদের আত্মাতে প্রকাশিত হইতেছ। আপনার আনন্দেই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ,

আনন্দের রাগিণীতে সকল আকাশ পূর্ণ করিয়াছ, আনন্দের আতিশয্যেই মানুষের বংশ-প্রবাহ চালাইতেছ, আনন্দের সাগর হইতে এখানকার সকল শিল্পকলার বিচিত্রতা প্রেরণ করিতেছ। প্রভাতে বিমল আনন্দে সূর্য্য আলোক দেয়, ফুল ফুটিয়া শোভা ও গন্ধ দেয়, পাখীরা গীত গায়, মানুষেরা শয্যাত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যে নিযুক্ত হয়, ইহার মধ্যে তোমারই পরিপূর্ণ আনন্দের অভিব্যক্তি দেখি। কেই বা প্রাণ ধারণ করিত, কেই বা শরীর চেষ্টা করিত, যদি তুমি এই জীবনকে, এই শরীর-চালনাকে এমন আনন্দের উৎস করিয়া না দিতে। এখানে আমাদের কত ভয় আছে, ভাবনা আছে, রোগ আছে, বিপদ আছে, মৃত্যু আছে, বিচ্ছেদ আছে, দারিদ্র্য আছে, পাপ আছে,—একবার তোমার মঙ্গল বিধানে সন্দেহ করিলে প্রতি পদক্ষেপে স্খলনের আশঙ্কা থাকে, প্রতি নিঃশ্বাসে ও অন্নগ্রাসে দূষিত জীবাণু ও রোগের বীজ গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা আছে, কত অচিন্তিত ও অনিবার্য্য প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুর্ঘটনা আমাদিগকে পীড়া দিতে পারে, কোন্ মুহূর্ত্তে আমরা এই সংসারের নিকট বিদায় লইয়া মাটির শরীর মাটিতে রাখিয়া চলিয়া যাইতে পারি। কিন্তু তুমি যে অমৃত-স্বরূপ, এজন্যই ত মৃত্যু-ভয় আমাদের বিচলিত করিতে পারে না, কারণ ইহলোকে যেমন পরলোকেও তেমন, এই জীবনে যেমন পরকালের অনন্ত জীবনেও তেমন, তোমারি আনন্দধামে চিরকাল বাস করিব। তোমার অমৃত নাম যখন নেই, তোমার আনন্দ রসে যখন ডুবি, তখন সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়, সকল চিন্তা, সকল

অশান্তি উদ্বেগ নিমেষে দূর হইয়া যায়। তুমি যখন প্রাণে আবির্ভূত হও তখন আনন্দের জোয়ারে আমরা কোথায় ভাসিয়া যাই, তখন আমাদের নিকট তোমার সংসার মধুময় হয়, প্রকৃতি নূতন শোভা ধারণ করে। তখন চন্দ্র সূর্য্য, আকাশ বাতাস, বৃক্ষলতা, ফুলফল, নদী সমুদ্র, মেঘ পর্ব্বত, পিতামাতার স্নেহ, ভাই ভগিনীর ভালবাসা সকলি নূতন আনন্দে জীবনকে পূর্ণ করিয়া ভরিয়া দেয়।

শান্তদেবতা নীরবে ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন ব্যাপার চালান।

১৯শে জানুয়ারী, শুক্রবার, ১৯১২। ৫ই মাঘ।

শান্ত দেবতা, সকল জগৎ যখন নিস্তব্ধ হইয়া যায়, বাহিরের জনকোলাহল যখন থামিয়া যায়, প্রকৃতির উপরে যখন অন্ধকারের কাল যবনিকা পড়ে, সকল জীবজন্তু যখন সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করে, ব্রহ্মাণ্ডের দেহে যখন হৃদয় স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায় তখন তুমি তাহার মধ্যে এক মহান্ গম্ভীর সত্তারূপে বিরাজ কর। অতিধীরে সন্তর্পণে তুমি আমাদের শরীরের সকল ক্ষতিপূরণ করিয়া, রক্ত-মাংস তাজা করিয়া আমাদিগকে দিনের কর্ত্তব্যের জন্য নূতন বল দাও। কি নিঃশব্দে তুমি এত বড় সৃজন ব্যাপার চালাইতেছ, কি কৌশলে ভূমিকে উর্ব্বরা করিয়া বীজকে অঙ্কুরে পরিণত করিতেছ, অঙ্কুর হইতে ফল ফুল পাতার

বিকাশ করিতেছ, কিরূপে শিশুকে যুবা, যুবাকে বৃদ্ধ করিয়া আত্মার ফুলগুলি ফুটাইয়া তুলিতেছ, আমরা জানিতেও পারি না। মানুষ যত কল কারখানা করে, তাহার চালনায় কত শব্দ, কত কোলাহল, কত জনতা, কত আড়ম্বর, ও মানুষ যত কাজ করে তাহার জন্য বাহিরে কত ঢাক ঢোল বাজাইয়া আত্মপ্রকাশ করে; আর তুমি এত বড় সৌরজগৎগুলিকে শূন্য পথে চালাইতেছ, এত বড় বড় ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষার জন্য, জীব জন্তুর আহার যোগাইবার জন্য বিচিত্র আয়োজন করিতেছ, অথচ কোন শব্দ নাই, কোন প্রয়াস নাই, কেমন সহজভাবে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে সৃষ্টি পূর্ণতার দিকে যাইতেছে। তুমি নিজকে জানাইবার জন্য নিজের গৌরব প্রচার করিবার জন্য কিছুমাত্র তাড়াতাড়ি কর না। মানুষ তোমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করে না, তোমাকে স্বীকার করে না, তোমার জ্ঞানময় মঙ্গলময় ইচ্ছাকে অন্ধ জড় শক্তির ক্রিয়ারূপে উপেক্ষা করে, এমন কি তোমার প্রতিষ্ঠিত সনাতন নিয়মের বিরুদ্ধে আচরণ করে, অথচ তুমি তাহাকে স্বাধীনতা দিয়া সুখ দিয়া নিজেকে পশ্চাতেই রাখিয়াছ, মানুষের নিকট তোমার সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বজ্ঞতা প্রমাণ করিবার জন্য কোন ব্যস্ততা নাই। অতি শান্ত সমাহিত ভাবে তুমি আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছ, আমাদের সকল পাপ অপরাধ ক্ষমা করিয়া সহিষ্ণুতা, প্রেম ও আশার সহিত আমাদিগের মঙ্গল বিধান করিতেছ।

আমাদের জীবন প্রেমময়ের প্রেমের স্রোত।

২০শে জানুয়ারী, শনিবার, ১৯১২। ৬ই মাঘ।

প্রেমময় পিতা, জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে তুমি আমাদের জন্য মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ সঞ্চার করিয়াছিলে। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তোমার বায়ু, তোমার মাটি, তোমার আলোক আমাদিগকে গ্রহণ করিল, কত স্নেহ, কত যত্ন, কত ভালবাসার মধ্যে আমরা পুষ্ট হইলাম। আমাদের জীবনটাই যে তোমার প্রেমের স্রোত—আমাদের অন্ন বস্ত্র তোমার দান, শরীর মন তোমার দান, বিদ্যাবুদ্ধি তোমার দান, আত্মীয় বন্ধু তোমার দান—আমার অস্তিত্ব, চৈতন্য, দেহের শক্তি, হৃদয়ের ভক্তি সকলিত তোমার। এই সুন্দর পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখিলাম, যাহা কিছু শিখিলাম সকলের মধ্যেই ত তোমারই প্রেমের প্রকাশ দেখিতে পাই। আমার বলিতে কি আছে? প্রেমময়ী জননী! কি অক্ষয় অনন্ত ভালবাসা অকাতরে তোমার সন্তানগণকে বিলাইতেছ। মানুষ একটু উপকার করিলে, সামান্য একটু সাহায্য করিলে আমরা মুখে কত ধন্যবাদ দেই, অন্তরে কত কৃতজ্ঞ থাকি, আর তুমি এত প্রেম লইয়া আমাদের কল্যাণের জন্য সারাদিন ব্যস্ত রহিয়াছ, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই আমাদের জন্য তোমার প্রকৃতির কর্ম্মচক্র ঘুরিতেছে, আমাদের জীবন রক্ষার জন্য তোমার বায়ু, তোমার জল, তোমার আলোক তোমার তাপের অফুরন্ত ভাণ্ডার মুক্ত রহিয়াছে। মানুষের সৃষ্ট

একটু গ্যাস তাড়িতের আলোর জন্য আমাদের দাম দিতে হয়, জলের জন্য আমাদের ট্যাক্স দিতে হয়—আর আমরা কিনা বিনামূল্যে তোমার এই প্রকৃতির অক্ষয় সম্পত্তিকে সকলে সমান ভাগে উপভোগ করিতেছি—এত প্রেমের ঋণ শোধ করিবার জন্য আমরা কোনই চেষ্টা করিব না, তোমাকে হৃদয়ের ধন্যবাদ দিব না, তোমাকে ভক্তি-পুষ্পের অঞ্জলিতে পূজা করিব না, এমন অপরাধ যেন আমাদের চিন্তায়ও না আসে। তুমি ত জীবন দিয়া আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছ, তুমি কত আনন্দ কত ভালবাসার মধ্যে আমাদের আত্মাকে বিকাশ করিতেছ—আমরা কি তোমার এই আনন্দ, এই ভালবাসা শ্রদ্ধার সহিত তোমার চরণে অর্পণ করিব না? তোমাকে উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইব না?

মহাপুরুষদের জীবনে মঙ্গলময়ের করুণার সাক্ষ্য।

২১শে জানুয়ারী, রবিবার, ১৯১২। ৭ই মাঘ।

মঙ্গলময় পিতা, সন্তানের মঙ্গলের জন্য তুমি কত রকম বিধান করিতেছ। কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায়, কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয় এই জ্ঞান আমাদের মনে দিয়াছ, আবার ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়া আমাদের পাপ পুণ্য দুইই সম্ভব করিয়াছ। আমাদের অন্তরে থাকিয়া অভ্রান্ত নৈতিক আদেশ প্রচার করিয়া

অশুভ কার্য্য হইতে বিরত রাখিতেছ ও শুভ কার্য্যে প্রেরণা দিতেছ। আমরা বিশ্বাস, ভক্তি, বিনয়ের সহিত তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য যত সাধনা করি ততই তুমি উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শ আমাদের নিকট প্রকাশিত কর। আমাদের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ফুটাইবার জন্য, প্রেম বিকশিত করিবার জন্য তুমি কত ঘটনা, কত অবস্থার ভিতর দিয়া আমাদিগের জীবনকে লইয়া যাইতেছ, মানবসমাজে তোমার সত্য, ন্যায়, মঙ্গল, শান্তি, পবিত্রতার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তুমি ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে নিয়মিত করিতেছ। কত প্রথা, কত আইন, কত নীতি, কত ধর্ম্ম, কত বিজ্ঞান, কত দর্শন তোমার মঙ্গল নিয়মকে মানবসমাজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতেছে। আবার মহাপুরুষদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের ভিতর দিয়া তোমার আধ্যাত্মিক সত্য সকল প্রচারিত করিতেছ, তাঁহাদের জীবনের দৃষ্টান্তে কোটি কোটি নর-নারীকে তোমার ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিতেছ। জগতের সাধু-ভক্তগণ তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া, তোমার প্রীতির জন্য মানবসমাজের সেবা করিয়া উন্নত জীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের বাক্যের ভিতর দিয়া তোমার জ্বলন্ত সত্য নিঃসৃত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রভাবে মানবসমাজের নীতি ও 'ধর্ম্মের' আদর্শ উচ্চ স্তরে উন্নীত হইয়াছে। তাঁহাদের জীবনে তোমার করুণার সাক্ষ্য দিয়া তুমি আমাদিগকে আশা ও উৎসাহে বলীয়ান্ করিতেছ। আকাশের চন্দ্র তারাকে যেমন তুমি সৃষ্ট করিয়া

তোমার জ্ঞানে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে চালাইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণ সাধন করিতেছ—তেমনি আমাদের আত্মাকেও তুমিই সৃষ্ট করিয়া, তুমিই মঙ্গলের দিকে চালাইয়া পরিণামে পরিপূর্ণ জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দ দিবে, ইহা স্থির জানিয়া আমরা কৃতজ্ঞ থাকিব।

ভয়ের ধর্ম্ম ও নিয়মের ধর্ম্ম।

২২শে জানুয়ারী, সোমবার, ১৯১২। ৮ই মাঘ।

এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ ভয়ে ভয়ে তোমার পূজা করিত। প্রকৃতির ঘটনা সকলের মধ্যে তোমার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তোমার শরণাপন্ন হইত, আর সূর্য্যের মধ্যে, চন্দ্রের মধ্যে, আকাশের মধ্যে, মেঘের মধ্যে, বায়ুর মধ্যে, জলের মধ্যে তোমাকে পৃথক্ করিয়া দেখিত ও তোমার অযাচিত আশীর্ব্বাদগুলিকেও সন্দেহের সহিত গ্রহণ করিয়া তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিত। তখন মানুষ তোমাকে নিতান্ত খামখেয়ালী সর্ব্বশক্তিশালী বিশ্বাধিপতি বলিয়া জানিত, তুমি ইচ্ছা করিলেই এই চন্দ্র সূর্য্যের আলো নিবাইয়া দিতে পার, তোমার নদী সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া, মৃত্তিকাকে ফল-ফুল-বৃক্ষ-লতাহীন করিয়া, মানুষকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালায় অস্থির রাখিতে পার, আবার ভীষণ ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা মহামারী বা দাবানল পাঠাইয়া সমুদয় জগৎ সংসারকে ও মানব সমাজকে ধ্বংস করিতে পার এই ভাবিয়া সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত।

অবিশ্বাসী মানুষ তখন অজ্ঞতার অন্ধকারে চারিদিকে কেবল ভয়ের মূর্ত্তিই দেখিত।

বর্ত্তমান জগতেরও কত জাতি কত দেশ এখনও শৈশবের উপযোগী ভয়ের ধর্ম্ম পালন করিতেছে। আমাদের কি সৌভাগ্য যে তুমি আমাদের নিকট তোমার নিয়মের ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম, আনন্দের ধর্ম্ম প্রচার করিলে। আমরা আজ তোমাকে প্রকৃতিতে নিয়মের প্রতিষ্ঠাতারূপে দেখিতেছি। যেমন জড়জগৎ তেমনি জীবজগৎ তোমার এক অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীনে চলিতেছে। অণুপরমাণুর আকর্ষণ বিকর্ষণের মধ্যে, গ্রহগণের গতি ও নক্ষত্রগণের স্থিতির মধ্যে, আলোক-উত্তাপ তাড়িতের ক্রিয়ার মধ্যে, জল বায়ুর পরিবর্ত্তন, ঋতু-মাস-পক্ষ অহোরাত্র পর্য্যায়ের মধ্যে, জোয়ার ভাঁটা, ঝড় বৃষ্টি, প্রভাত সন্ধ্যা, নদীর প্রবাহ, সমুদ্রের ঢেউ, নানা বর্ণ, নানা শব্দ, বিচিত্র রস ও গন্ধ, পর্ব্বত উপত্যকা কানন প্রান্তর, মরুভূমি ও শস্যক্ষেত্র, ফুলফল ওষধি বনস্পতি—সকলের মধ্যে তোমারই সনাতন অপরিবর্ত্তনীয় সত্তার পরিচয় পাইতেছি। আবার জীবজগতে জন্ম বৃদ্ধি, বংশ-বিস্তার ও মৃত্যু, দেহের রক্তচালনা, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, পরিপাক ক্রিয়া ও দূষিত-বর্জ্জনের মধ্যে তোমার একই বিধান প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

মানুষের জ্ঞান ও শক্তির মধ্যে মঙ্গল-বিধাতার অনন্তপ্রেমের পরিচয়।

২৩শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার, ১৯১২। ৯ই মাঘ।

পৃথিবীর মধ্যে তোমার নিয়ম আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান আমাদিগকে অভয় দিয়াছে, তোমার অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির অভ্রান্ত প্রমাণ দিয়াছে এবং নিয়মের অধীনতা স্বীকার করিয়া তোমার বুদ্ধি ও তোমার জ্ঞান এর সাহায্যে কত অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। কত যন্ত্র কত উপাদান, কত খাদ্য কত বস্ত্র, কত কল কারখানা নিত্য নূতন উপায়ে বিচিত্র ধরণে উদ্ভাবনা করিয়া, শিল্প-কৃষি-ব্যবসা-বাণিজ্য, রেলগাড়ী, অনুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ, কৃত্রিম জল, কৃত্রিম আলোক প্রচলন করিয়া প্রকৃতিকে ও মানব সমাজকে কল্যাণের দিকে লইয়া যাইতেছে। মানুষের আত্মাতে তুমি স্বাধীনতা দিয়াছ, তোমার জ্ঞান, প্রেম ও মঙ্গল ভাব বিকশিত করিয়া তাহাকে তুমি প্রাকৃতিক শক্তি ও নিয়ম হইতে উর্দ্ধে রাখিয়াছ, এজন্যই মানুষ প্রকৃতির ভিতর হইতে তোমার প্রচ্ছন্ন শক্তি সকল উদঘাটন করিতে পারে; এজন্যই মানুষ প্রকৃতির পশ্চাতে তোমার নিয়মের শৃঙ্খলা জানিতে পারে ও প্রকৃতির উপর তোমার মঙ্গল শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নানা শিল্প-বিজ্ঞান উদ্ভাবনা করিতে পারে। মানুষকে তুমি এত অধিকার, এত শক্তি দিয়াছ—ইহা তোমার অনন্ত প্রেমেরই পরিচয়। তোমার এমন কোন প্রয়োজন ছিল না, এমন কোন বাধ্যতা ছিল না যে মানুষ

এই জগতের রাজপদ পায় ও তোমার সৃষ্টি-রহস্য জানে। তুমি আপনার প্রেমেই মানুষকে সৃজন করিলে, আপনার প্রেমেই তাহার ইচ্ছাকে স্বাধীন করিয়া আপনাকে সীমাবদ্ধ করিলে। মানুষ যে তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, তোমার মঙ্গল-নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়, তাহাতেও তুমি সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল থাকিয়া তাহাকে প্রীতি দাও—কারণ ইহাতেই তোমার আনন্দ। তুমি জান মানুষ তোমার স্বর্গরাজ্য স্থাপনে সহযোগিতা করিবে। মানুষ অজ্ঞতা, দুর্ব্বলতা ও অন্ধতাহেতু সাময়িক প্রবৃত্তি ও অহঙ্কারে তোমাকে যতই কেন ভুলিয়া থাকুক না, তোমার মঙ্গল পথ হইতে যতই কেন দূরে যাউক না, তাহার পতনেরও একটা সীমা আছে—একদিন তাহাকে অনুতাপে লজ্জায় ঘৃণায় ম্রিয়মাণ হইয়া "পিতা পিতা" বলিয়া তোমার কোলে ছুটিয়া আসিতে হইবে। ইহা তুমি নিশ্চয় জান।

আমাদের শারীরিক জীবনের সহিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস একসূত্রে গ্রথিত।

২৪শে জানুয়ারী, বুধবার, ১৯১২। ১০ই মাঘ।

আমাদের শরীর পৃথিবীর, আত্মা স্বর্গের। শরীর ধারণ করিয়া আমরা তোমার জড় ও জীবসমাজের সহিত সমধর্ম্মী হইয়াছি ও প্রাকৃতিক শক্তি ও নিয়মের অধীন হইয়াছি। তুমি সামান্য ধূলিকণার সহিত অতি ঊর্দ্ধে গ্রহ নক্ষত্রগুলিকে একই নিয়মে

বাঁধিয়াছ, কাহারও সাধ্য নাই তোমার কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা হইতে এক চুল সরিয়া যায়। আমাদের এই শরীর সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের সহিত একসূত্রে গ্রথিত, আমাদের দেহ-তত্ত্ব জানিতে হইলে তোমার বিশ্ববিজ্ঞান পাঠ করিতে হয়। কত কোটি কোটি যুগের অভিব্যক্তির ফলে, কত সৌরজগতের বিনাশ ও লয়ের পরে আমাদের পৃথিবী জল-স্থল-বায়ুময় আকার পাইয়াছে, আরও কত যুগ যুগান্তর পরে এখানে প্রাণীপুঞ্জের অভিব্যক্তি হইয়াছে, কত জীবনসংগ্রাম, কত যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের ফলে মানবজাতির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার পর কত ভিন্ন অবস্থার সংঘর্ষে, কত ভিন্ন জলবায়ু, প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার সংঘাতে, ভারতীয় ভাষা, ধর্ম্ম, রীতিনীতি ও সভ্যতার বিবর্ত্তন হইয়াছে। এই সভ্যতার বিশেষ স্তরে আমাদের পরিবারের বংশাবলীর বিস্তৃতির ফলে এক শুভ মুহূর্ত্তে তুমি আমাকে মাতৃগর্ভে সঞ্চার করিলে—এইরূপে সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসের সহিত আমার অতীত ইতিহাসকে শৃঙ্খলিত করিয়াছ, কত জীবাণু, কত পশুপক্ষীর দেহের ভিতর দিয়া সংগ্রাম করিয়া তবে আমি মনুষ্য জন্ম পাইয়াছি, আবার কত অসংখ্য শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থার প্রভাবে আমার বর্ত্তমান শিক্ষা, রুচি, আচার, জ্ঞানবুদ্ধি, দেহ-মনাত্মক জীবন গঠিত হইয়াছে। ইহার বিশ্লেষণ করিতে অনন্ত কাল লাগিবে, কিন্তু তোমার জ্ঞানে আমার জীবনের প্রত্যেক স্তর, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের বিবরণ স্থান পাইয়াছে, তুমি এক পলকে আমার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সহিত সমুদয় জগতের সম্বন্ধ অধ্যয়ন

করিতেছ। আমার এই শরীরের খাদ্যবস্ত্রও আরামের জন্য পৃথিবীর কত অগণ্য জীবজন্তু ও মানুষ শরীর ক্ষয় করিতেছে, আমার প্রতিমুহূর্ত্তের শরীর ধারণের জন্য সূর্য্যের তাপ ও আলোক, বায়ুর চালনা, সমুদ্রের জল, পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থা কত রকমের পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে, আমি এত সকল অজ্ঞাত রহস্যময় নিয়মের দ্বারা শৃঙ্খলিত রহিয়াছি—শরীর আমাকে বন্দী করিয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অনন্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত সত্য সর্ব্বত্র।

২৫শে জানুয়ারী, ১৯১২। ১১ই মাঘ, বৃহস্পতিবার।

আজিকার উৎসবের দিনে তোমাকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করি—তুমি যে মহান্ আদর্শ প্রচার করিবার জন্য জগতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত করিয়া লইবার জন্য আমাদিগকে ডাকিয়াছ। আজ আমরা সকল পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষদের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার উপহার দেই। যাঁহারা তোমাকে করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় ধরিয়াছিলেন, যাঁহারা তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া ঋষি পদবী লাভ করিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন দেশে তোমার অধ্যাত্ম লোকের সংবাদ নিজদের জীবন দ্বারা, উপদেশ ও লেখনীর সাহায্যে প্রচার করিয়াছেন—সেই ঋষি যোগী, ধর্ম্ম-

প্রচারক, সাধু-ভক্তদের আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়া আমরা গৌরবান্বিত হইয়াছি। আজ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মের মধ্যে দেখিয়া আমাদের আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ করিয়া লই। জগতে যে সকল ধর্ম্ম-বিধান প্রচলিত হইয়াছে তাহাদের নিকট আমাদের ঋণ স্বীকার করিয়া এবং তাহাদের সঙ্গে আমাদের যে পার্থক্য তাহা স্মরণ রাখিয়া আমরা সকল ধর্ম্মসমাজকে এই উৎসবে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করি। বুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টকে আশ্রয় করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম, মহম্মদকে অনুসরণ করিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্ম, কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম ত কোন বিশেষ অবতারকে বা বিশেষ শাস্ত্রকে অবলম্বন করে নাই, আমরা ব্রহ্মকে উপাসনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। তুমিই আমাদের আদর্শ গুরু, আদর্শ পিতা, আদর্শ প্রভু, আদর্শ সখা, আদর্শ স্বামী। আমাদের শাস্ত্র কোন বিশেষ গ্রন্থে আবদ্ধ নয় বলিয়াই আমাদের অনন্ত শাস্ত্র সমুদয় জগৎ পুস্তকের ছত্রে ছত্রে, গ্রহ তারকার উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। পৃথিবীতে, নদী-সমুদ্রে, পর্ব্বতে অরণ্যে, পাখীর গানে, ফুলের শোভায়, ফলের মধুরতায়, আকাশে, মেঘে ও বায়ুতে তোমার অঙ্গুলি-রচিত প্রকৃতির গ্রন্থ চিরকাল মুক্ত রহিয়াছে, যে চায় সেই পড়িতে পারে। কোন ধর্ম্ম-জাতি-বর্ণ বিভেদ না করিয়া, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, সাধু ও পাপীর ভেদ না করিয়া সকল ব্যাকুল আত্মার কাছেই তুমি সত্য প্রকাশ করিতেছ। আবার মানব মনের গভীর তত্ত্বে, ইতিহাসের ঘটনাবলীতে, বিজ্ঞানের রহস্যময় আবিষ্কারে, নীতি ও ধর্ম্মের

মঙ্গল নিয়মে ও অনুষ্ঠানে সর্ব্বত্রই তুমি অভ্রান্তরূপে তোমার সত্য, তোমার অনুশাসন প্রচার করিতেছ। আমরা আজ তোমাকে আমাদের ধর্ম্ম-সমাজের নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা জানিয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণিপাত করি।

ভারতে সনাতন বিশ্বজনীন উদার ধর্ম্মের অভিব্যক্তি।

২৬শে জানুয়ারী, ১৯১২। ১২ই মাঘ, শুক্রবার।

ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব তোমার এক আশ্চর্য্য বিধান। যুগে যুগে ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে কত সম্প্রদায় কত সমাজের অভ্যুদয় ও অবনতি হইয়াছে, বিশাল হিন্দু ধর্ম্মের মহাসমুদ্রে কত বৌদ্ধ, শিখ, বৈষ্ণব শাক্তসমাজই লয় পাইয়াছে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানোন্নত সভ্যতাভিমানী জাতিদের নিকট ও যে ভারতীয় ধর্ম্ম-প্রবাহের একটী স্রোত নূতন সত্য, নূতন আদর্শ লইয়া উপস্থিত হইবে তাহা কে ভাবিত, কে কল্পনা করিতে পারিত? যে দেশ অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল,—পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, চিরবৈধব্য, সহমরণ যে সমাজে পুতিগন্ধময় আবর্জ্জনার সৃষ্টি করিয়াছিল, পরিবারে পিতা ও স্বামী, সমাজে গুরু ও পুরোহিত যে দেশের চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতাকে রুদ্ধ রাখিয়াছিল, যেখানে

আচারে অনুষ্ঠানে কেবল ভেদবুদ্ধি, কেবল বন্ধন মানবাত্মাকে সঙ্কুচিত করিয়াছিল, যেখানে বেদকে অভ্রান্ত শাস্ত্র, কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞান করিয়া কেবল পশ্চাতের দিকেই মানুষের মুখ ফিরাইতে হইত, এবং অন্য জাতির অন্য ধর্ম্মের সহিত মিলনের ভিত্তিকে না খুঁজিয়া কেবল সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামির আতিশয্য মানুষকে অন্ধ করিয়া রাখিত, সেই দেশে সেই সমাজে কিরূপে তুমি এই সনাতন বিশ্বজনীন উদার ধর্ম্মকে অভিব্যক্ত করিলে, এবং নানা কুসংস্কার, নির্য্যাতন ও প্রতিকূলতার মধ্যে একটি মাত্র আত্মার সাহায্যে এই নূতন ধর্ম্মকে জয়যুক্ত করিলে, ভাবিয়া বিস্ময়ে ভক্তিতে মস্তক আপনি অবনত হইয়া যায়। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ত আজ কেবল ভারতের ধর্ম্ম নয়, ইহা সমুদয় জগতের ধর্ম্ম, কেবল ব্রাহ্মের ধর্ম্ম নয়, সমুদয় মানবজাতির ধর্ম্ম, কেবল বিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম নয়, ইহা অনন্তকালের ধর্ম্ম। আগে মানুষ তোমাকে দূর দেশে দূরকালে স্বর্গলোকে আসীন মনে করিত, তাহাদের ধর্ম্ম কেবল ভবিষ্যতের দিকেই চাহিত, আমরা তোমাকে

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ,
যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু,
তস্মৈ দেবায় নমো নম।"

এই বলিয়া সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত দেখিতেছি, সকল দেশে, সকল জাতিতে, সকল ধর্ম্মে তোমার এক প্রেম-পরিবার জানিয়া

চিন্তার স্বাধীনতা ও সমাজের মঙ্গল অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া মুক্তির পথে তোমার সহিত মিলনের দিকে অগ্রসর হইতেছি।

তাঁহার ধর্ম্ম তিনি প্রচার করিবেন।

২৭শে জানুয়ারী, ১৯১২। ১৩ই মাঘ, শনিবার।

তুমি আমাদের হাতে যে সত্য ধর্ম্মের পতাকা দিয়াছ, আমরা তাহার ভার বহন করিতে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত তাহা জানি। আমরা দীন দরিদ্র, দুর্ব্বল, অল্প-বিশ্বাসী, তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ আমরা হৃদয়ে পোষণ করি কিন্তু জীবনে সফল করিতে পারি নাই। আমাদের বিশ্বাস ও আচরণ, আকাঙ্ক্ষা ও জীবন, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান! কিন্তু আমরা তোমাকেইত পিতা, গুরু, সখা, স্বামী বলিয়া জানি—তোমার সত্য তুমিই প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবে ইহা বিশ্বাস করি। যদি আমরা এমন ধর্ম্ম-বিধানকে জয়যুক্ত করিতে অক্ষম হই তবে আমাদিগকে তুমি পতিত, হীন করিয়া আমাদের চেয়ে যারা যোগ্যতর, জ্ঞানে প্রেমে ইচ্ছায় পূর্ণতর, এমন মানুষদের উপর তোমার ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের ভার দিবে। আমরা যেন মর্ত্ত্যের ধূলিতে মলিন হইয়াও তোমার এই মঙ্গল বিধানকে অন্যের দ্বারা জয়যুক্ত দেখিয়া আনন্দ পাই। প্রেম, পুণ্য, শান্তি, আনন্দ, ন্যায়, সত্য, দয়া, ধর্ম্ম—এই সকল দেবভাব লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম

পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য বিস্তার করিতে আসিয়াছে, আমরা হয়ত পরাজিত নিরাশ হইতে পারি কিন্তু তোমার ধর্ম্ম তুমি প্রচার করিবে।

আজ এই উৎসবের মধ্যে তুমি আমাদের নূতন আশা, উৎসাহ, বল ও বিশ্বাস জাগাইয়া দাও। আমাদের দায়িত্ববোধ প্রবল করিয়া দাও। আমাদের জীবনকে তোমার মহাদান রূপে গ্রহণ করিয়া, আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্মকে তোমার স্বর্গীয় আদর্শরূপে ধারণ করিয়া, এই পৈতৃক অমূল্য রত্নকে যাহাতে জগতের ব্যবহারে লাগাইতে পারি ও দুঃখী-দরিদ্র, পাপীতাপীদের সেবায়, ব্যথিতের সান্ত্বনায়, রোগীর শান্তিতে ইহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি তোমার চরণে এই ভিক্ষা করি। আজ সমুদয় মানবজাতির সহিত আমাদের হৃদয়ের বন্ধন, ভ্রাতৃত্বের যোগ অনুভব করিতে দাও। জীবনের সকল আনন্দের মধ্যে, সকল ভালবাসার মধ্যে যাহাতে তোমাকে পাই, বিপদে সম্পদে, রোগে সুস্থতায় যাহাতে তোমার মঙ্গল হাতের পরিচয় পাই, সকল আত্মীয় বন্ধুর মুখে ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে যাহাতে তোমার সৌন্দর্য্য, তোমার প্রেম-মুখের ছবি দেখিয়া ধন্য হই,—এই আশীর্ব্বাদ কর।

তাঁহার চরণ স্পর্শে জীবনের মুখ ফিরিয়া যায়।

২৮শে জানুয়ারী, ১৯১২। ১৪ই মাঘ, রবিবার।

ব্রাহ্মসমাজের দেবতা, আমরা সংসারে ও সমাজে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি কৈ? তুমি যদি গৃহে পরিবারে বিরাজ করিতে তবে কি আমরা এমন লঘুভাবে জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিতাম? তবে কি আমরা অসার গল্পে আমোদে মত্ত থাকিতে ভালবাসিতাম? তবে কি আমরা এত স্বার্থপর, এত অহঙ্কারী ও এত অভিমানী হইয়া মানুষের নিকট অপ্রেম ও উদ্ধত ব্যবহার দেখাইতে পারিতাম? আমরা ব্রহ্ম-উপাসক হইয়া তোমার উপাসনা করিতে জানিনা, তোমাতে বিশ্বাস করি অথচ তুমি কেমন তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি না, তুমি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছ অথচ তোমাকে পূজা করিবার জন্য আমরা আচার্য্য পুরোহিতের আশ্রয় করি। তুমি আমাদের অন্তরে সত্য সুন্দর মঙ্গলরূপে বিরাজ করিতেছ, অথচ আমরা বহির্জ্জগতে তোমার প্রতিবিম্ব দেখিয়াই ভুলিয়া থাকি, আমাদের আত্মা বহির্ম্মুখীন হইয়া কেবল ক্ষণিক অসার সুখই খুঁজিয়া বেড়ায়। তুমি যে কত সুন্দর, তোমার মধ্যে যে সকল শক্তি, সকল জ্ঞান, সকল প্রেম ও

পুণ্যের উৎস রহিয়াছে, অন্তরে প্রবেশ করিয়া একবার তোমার চরণ স্পর্শ করিতে পারিলে যে আমাদের জীবনের মুখ ফিরিয়া যায়, আমাদের প্রাণে নূতন আশা, উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি জাগিয়া উঠে, নূতন সত্য প্রকাশিত হয়, নূতন প্রেমে জগৎ মধুময় হয়, নূতন তেজে জীবন দেবভাবাপন্ন হয়,—তাহা আমরা ভাবিনা বলিয়াই তোমার প্রতি সকল হৃদয় মন সমর্পণ করিতে পারি না। আজ লজ্জায় ঘৃণায় ম্রিয়মান হইয়া স্বীকার করিব যে আমরা তোমার অপরাধী সন্তান। আমরা পৈতৃক ভাণ্ডারের পরিচয় পাইলাম না, পিতার সহিত মিলিত হইতে পারিলাম না। এজন্যই আমরা সর্ব্বত্র অপমানিত, সর্ব্বত্র অবজ্ঞাত। এজন্যই আমরা দুর্ব্বল, কাপুরুষ, ভীরু। তোমার স্পর্শ যারা পায় তাহাদের মুখে তোমার জ্যোতিঃ পড়ে, তাহাদের জীবনে তোমার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হয়। আমরা তোমাকে সত্যভাবে বিশ্বাস করি নাই, পূজা করি নাই, এজন্যই আজ ব্রাহ্মসমাজের এত দারিদ্র, এত দুরবস্থা। জগতের মহাধর্ম্মের বীজ লইয়া, মানুষের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ লইয়া যে ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর সকলকে মুক্তি দিতে আসিয়াছে, আমাদের দোষে তাহার এত ক্ষুদ্রতা।

তুমি আমাকে যন্ত্রের মত চালাও।

১লা মাঘ, মঙ্গলবার, ১৯১৩।

বিশ্বাসের চক্ষুতে তোমাকে যেমন সহজে দেখিতে পাই, জ্ঞানে তেমন নয়। জ্ঞান কেবল সাধারণকেই আশ্রয় করে, কিন্তু বিশ্বাসগত জীবন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ ঘটনায় তোমাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করে। আমার জীবনের পশ্চাতে চাহিয়া দেখি প্রত্যেক স্তরে তোমার অঙ্গুলির ছাপ রহিয়াছে। এখনও প্রতিদিনের কার্য্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাই আমার ইচ্ছার, আমার চেষ্টার পশ্চাতে ও উপরে তোমার মহান্ উদ্দেশ্য, তোমার মঙ্গল বিধান কাজ করিতেছে। তুমি আমাকে যন্ত্রের মত চালাইতেছ। যেখানে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়াছি সেখানেই তুমি আমার আতিশয্যকে পিষিয়া সমান করিয়াছ; যেখানে তোমার নিয়মের অনুকূলে চলিয়াছি, সেখানে তুমি দশগুণ হস্তীর বল দিয়াছ। প্রেমময় তুমি আমার নিকট সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ।

তুমি আপন হইতেও আপন।

২রা মাঘ, বুধবার, ১৯১৩।

একটি দ্বার তোমার জন্য খোলা রাখিয়াছি—প্রতিদিনের প্রার্থনার ভিতর দিয়া তুমি অন্তরে প্রবেশ করিও। চৈতন্যময় দেবতা, আমাদের চৈতন্যের মধ্যেইত তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ,

সংসারের নানা কাজে তুমি আছ এই জ্ঞানটুকু হারাইয়া ফেলি, কিন্তু চক্ষু বুজিয়া যখন নিজের অন্তরাত্মার দিকে তাকাই তখনই তোমার সত্য স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। ধর্ম্ম চিরকালই তোমাকে আত্মার মধ্যে দেখিবার পথ বলিয়া দিয়াছে। তুমি যে আপন হইতেও আপন, তোমার মধ্যেই যে আমাদের পরম শান্তি, পরম আনন্দ, ইহা যেন প্রতিদিনের প্রার্থনা ও আত্মচিন্তার ভিতর দিয়া নূতন করিয়া স্মরণ করি, অনুভব করি। তোমার সহিত প্রীতিযোগে যুক্ত হওয়ার সাধনা যেন জীবনে সহজ হইয়া যায়। আমার ক্ষুদ্রতার মধ্যে, আমার মলিনতার মধ্যে যেন আমি আবদ্ধ না থাকি; তোমার বিশ্বরাজ্যের সহিত যেন যুক্ত থাকি।

তোমার সহিত যোগে আমাদের সত্য পরিচয়।

৫ই মাঘ, শনিবার, ১৯১৩।

প্রতিদিনের খাওয়া, নিদ্রা, জাগরণের মধ্যে ত আমাদের সমাপ্তি নাই। আমাদের জীবন যে অনন্তকে চায়, অল্পেত আমাদের সুখ নাই। যদি অল্পে মানুষ সন্তুষ্ট থাকিত তবে তোমার কাছে আসিবার অভাব অনুভব করিত না। পাখী যেমন হাওয়ার মধ্যে উড়িতে ভালবাসে, 'মাছ যেমন জলে সাঁতার কাটিতে ভালবাসে,

তেমনি আমাদের আত্মা তোমার মধ্যে বিহার করিতে স্বভাবতঃই চায়। আমাদের শরীর জড় ধর্ম্মী, সেজন্য শরীরকে জড় প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, আমাদের জীবনী শক্তির উপাদান অন্নজল, বায়ু, আলোক বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হয়, কিন্তু আত্মা শরীরের উর্দ্ধে, প্রাণেরও পশ্চাতে, আত্মার অন্নজল পরমাত্মার জগতে। যাহা দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, ধরা যায় না তার জন্য আমাদের আত্মা ব্যাকুল—সত্যের জন্য মঙ্গলের জন্য, সুন্দরের জন্য পিপাসু আমরা সকলেই। কেননা সত্য, সুন্দর, মঙ্গল অনন্ত, কোন দৃশ্য বস্তুর মধ্যে বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য-সত্তার মধ্যে ইহাদের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের অন্তরে তুমি ইহাদিগকে প্রকাশ করিতেছ বলিয়াই আমরা ইহাদিগকে জীবনে পাইবার জন্য সাধনা করি। আমাদের মধ্যে তোমার প্রকাশ পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হয়, ইহাইত আমাদের জীবনের একমাত্র চেষ্টা একমাত্র চিন্তা। আমরা জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক—সংসারের সকল কর্ম্মে, সকল বিশ্রামে, সকল হাসিগানে, আনন্দে সকল ভালবাসায় তোমাকেই চাহিতেছি। আমাদের বাক্যে চিন্তায় তোমাকেই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমাদের নীতি ও কর্ম্মে তোমারই মঙ্গলভাব প্রস্ফুটিত করিতেছি। আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে নিয়া যাও, এই প্রার্থনার মধ্যেও এই কান্নাই প্রকাশ পায়। আমরা যে অন্ধকারে থাকিতে ভালবাসি না, আমাদের চিন্তা অস্ফুট, আমাদের জ্ঞান ক্ষুদ্র, এই অবস্থাত সহ্য হয় না, যতটুকু আমাদের চৈতন্য প্রসারিত হয়

ততটুকুই আমাদের জীবনের সার্থকতা। আমাদের চারিদিকে অসত্য অনিত্য জিনিষ, যাহা এই আছে এই নাই, আজ যাহা উপভোগ করি, কাল যার জন্য অনুতাপ করি, যাহা বিশ্বের মূল কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত নয়, তাহাতে আমাদের সাময়িক তৃপ্তি হইতে পারে, কিন্তু স্থায়ী ভাবে আমরা তাহার সহিত যুক্ত হইতে পারি না। যাহা সত্য তাহা নিত্য অথচ পুরাতন নয়, চির নূতন ও বিচিত্র ; এই সত্যেই আমাদের আত্মার স্থিতি গতি ও পরিণতি। মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতে লইয়া যাও। যতটুকু আমাদের জ্ঞান ততটুকু জীবন, যতটুকু প্রেম ততটুকুই জীবন, যতটুকু শুভ কামনা ততটুকুই জীবন। জীবনের নিম্নস্তরে দেখা যায় আপনার মধ্যেই আপনি সম্পূর্ণ ; অথচ বাহিরের অবস্থার অধীন। উন্নত প্রাণীদের লক্ষণ এই যে নাড়ীর যোগে আপনার বংশের সহিত যোগ হয়, অতীতের সহিত অনাগতের, আপনার সহিত বংশের, অন্তরের সহিত বাহিরের যোগ ক্রমেই বাড়ে, অথচ তারা স্বাধীন। মানুষ যত উন্নত হয়, তত একদিকে তার স্বাধীনতা বাড়ে, কিন্তু তার আত্মা প্রসারিত হয়। আমাদের এই উন্নত জীবন দাও, আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে তোমার অধীনে আন। তুমি সকল হৃদয়, সকল মন, সকল আত্মাকে নাড়িয়া দাও, অন্তরের গভীরতম প্রদেশে ভাবের আলোড়ন উপস্থিত কর, আমাদের পরিবর্ত্তন হইয়া যাউক। তোমার সহিত যোগে আমাদের সত্য পরিচয় লাভ করি। তুমি প্রাণে আসিয়া আমাকে প্রাণিত কর, তোমার আলোকে আমি সংসারে নূতন চক্ষু লইয়া প্রবেশ করি।

ভগ্নবীণার ছিন্নতারে নূতন ঝঙ্কার।

১৪ই জানুয়ারী, বুধবার, ১৯১৪।

হে আমার ভগ্ন বীণা! আবার তুমি ছিন্ন তার জোড়া দিয়া পুরাণো মধুর রাগিনীতে আমার হৃদয় ঝঙ্কৃত কর। হে আমার দূরে যাওয়া গান, উড়ে যাওয়া পাখী, হে আমার হারান ধন, তুমি আবার ফিরিয়া আস, আবার আমার মনের রাজ্যে সরস বর্ষা নামাও; আবার আমাকে দিব্য দর্শন দিয়া সৌন্দর্য্য, প্রেম, আনন্দের অক্ষয় অতীন্দ্রিয় রাজ্য দেখাও। এই বৎসরের বন্ধুহীন, সমাজহীন মাঘোৎসব আমার জীবনের পক্ষে নবযুগের প্রবর্ত্তক হউক। আমার মস্তকে স্বর্গ হইতে করুণার ধারা অবতীর্ণ হইয়া নূতন সত্য, নূতন ভাষা, নূতন আদর্শ ও নূতন আশার প্রেরণায় উৎসাহিত করুক। আবার ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য, দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম্মবিষয়ক ও নৈতিক উন্নতির জন্য নব নব চিন্তার উদ্দীপনা আসুক। আবার পুরাতন ব্রতগুলি শতগুণ তেজে বলীয়ান হইয়া শত বাধা অতিক্রম করিয়া আমার চিত্ত অধিকার করুক। আবার পরমাত্মার চরণে আত্মাকে সমর্পণ করিয়া নিজের স্বার্থ নিজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়া তাঁহার হাতের যন্ত্র হইয়া যাই।

কবে আমি তোমার সেবায় আত্মদান করিব ?

১৮ই জানুয়ারী, রবিবার, ১৯১৪।

হে করুণাময়! তোমার করুণার কথা কোন্ ভাষায় প্রকাশ করিব? তুমি আমার মত অধম পতিত জনকে এত অযাচিত করুণার অমৃত দান করিতেছ। আমি প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে তোমার করুণায় বাঁচিতেছি, হাসি আনন্দে, প্রেমে তোমার জগতে বাস করিতেছি, নিত্য নূতন জ্ঞান লাভ করিতেছি, তোমার পুত্র কন্যাগণের সেবার জন্য প্রেরণা লাভ করিতেছি। তবু ত আমার দৈন্য ঘুচিল না, আশা মিটিল না; দুঃখ দূর হইল না। প্রভো, তুমি জান আমি কত অহঙ্কারী, স্বার্থপর, বাসনার দাস হইয়া লক্ষ দিকে ছুটিতেছি। আমি জ্ঞানের পিপাসা দূর করিতে গিয়া অনিত্য, অসত্য অজ্ঞতার মোহে ডুবিতেছি, তোমাকে ছাড়িয়া আপনাকে দেখিতেছি, আপনার চিন্তাই ভাবিতেছি। অথচ তুমি যে আমার পরম আত্মা, সত্য আত্মা, নিত্য আত্মা, তোমার কাছে আত্মবলিদান করাই যে পরমার্থ তাহা জানিয়াও কাজে কথায় অভ্যাসে সাধন করিতেছি না। আমার চিরজীবন কেবল অসত্য, অন্যায়, পাপ, মোহ, প্রেয়ের দাসত্বেই কাটিল। কবে তুমি আমাকে তোমার সেবায় সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া জনমের মত মুক্তি দিবে?

প্রিয়জনের মধ্যে তোমার প্রকাশ।

২৪শে জানুয়ারী, শনিবার, ১১ই মাঘ, ১৯১৪।

অনন্ত দেবতা তুমি অনন্তরূপে আপনাকে আমাদের নিকট প্রকাশিত করিতেছ। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে, মানব হৃদয়ের প্রেমে তোমার বিচিত্র লীলা প্রতিদিন প্রকটিত হইতেছে। আমি অন্তরে তোমাকে অন্তর যামী, প্রেমময় স্বামী, সদ্‌গুরু ও শুভবুদ্ধিদাতা-রূপে দেখি, বাহিরের জড় জগতের ঘটনা সংঘাতে জীব রাজ্যের প্রাণন ব্যাপারে তোমাকে মহাশক্তিরূপে, মহাপ্রাণরূপে জানি, কিন্তু সংসারের সকল গুরু বন্ধু আত্মীয় প্রিয়জনের মধ্যে তোমার প্রেমের যে মধুর স্পর্শ পাই তাহাতেই আমার শান্তি ও আনন্দ। আমি যাহাদের ভালবাসি, তাঁহাদের মধ্যে আমার নিজের প্রকৃত আদর্শ স্বরূপ দেখিতে পাই, আমার সকল আকাঙ্ক্ষা, অনন্ত-কালের সকল প্রীতি তাঁহাদের মধ্যে মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে অনুভব করি—সেখানেই তোমার প্রকাশ আমার কাছে সকলের চেয়ে সার্থকতম। আমি সেখানে যেমন সহজে নিজকে ভুলিতে পারি, আত্মদান করিতে পারি; তোমার সেবায় প্রেরণা, উৎসাহ ও সহায়তা পাই এমন আর কোথাও নয়। তুমি জান আমি কত দুর্ব্বল, কত মলিন, কতবার পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়, তাই আজ আমি মর্ত্ত্যদেহে প্রিয়জনের মধ্যে তোমার যে প্রকাশ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তোমার পবিত্র আলোক ও বায়ুর দিকে মাথা তুলিতে চাই।

তুমি আমার প্রেমের গুরু।

২৬শে জানুয়ারী, সোমবার, ১৯১৪।

আমার সত্য মিথ্যা সকলি ভুলাইয়া দাও। আমার পাপ পুণ্য সকলি তুমি গ্রহণ কর। আমি জানি না কাঁলের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছি। কোন নিয়ম নাই, কোন লক্ষ্য নাই, কেবল কলের মত কখন ধীরে কখন জোরে চলিতেছি। নিজের ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা, স্বনিয়ন্তৃত্ব কিছুই নাই। শরীরের জড়তা, হৃদয়ের নীরসতা, মনের শৈথিল্য, আত্মার অসারতা, আমাকে অন্ধকার শীত ঋতুর অভিজ্ঞতা দিতেছে। কেবল একটি ক্ষীণ আলোকের রেখা এই অন্ধকার ভেদ করিয়া আমাকে পথ দেখাইতেছে, আমাকে আশা দিতেছে, উৎসাহ দিতেছে, ঊর্দ্ধ মুখে প্রেরণা দিতেছে। স্বর্গের পারিজাত, পৃথিবীর উজ্জ্বল রত্ন ভালবাসা আমাকে সজীব রাখিয়াছে ও ভালবাসার পাত্রদের নীরব উপহার দিতে গিয়াই আমার এই ভগ্নবীণার ছিন্নতারে মধুর রাগিণী ঝঙ্কৃত হইতেছে। তুমি আমার প্রেমের গুরু, আমি প্রেমের কিবা জানি। তুমি কৃপা করিয়া যেটুকু প্রেমের অভিজ্ঞতা দিয়া আমাকে উচ্চতর গভীরতর জীবনের সহিত পরিচিত করিয়াছ, তাহাই আমার গৌরব, তাহাতেই আমি ধন্য।

তুমি কৃপা করিয়া নিজকে প্রকাশিত করিয়াছ।

২৭শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার, ১৯১৪।

অনন্ত দেবতা, তোমার লীলা আমরা কিরূপে বুঝিব? অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া তোমার আধিপত্য, কি মহান্ শক্তি, কি অসীম জ্ঞান, কি গৌরবান্বিত মহিমায় তুমি এই জগৎ ব্যাপার চালাইতেছ, আমরা তাহার কি জানি? এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ইতিহাসই আমরা ভাল করিয়া জানি না, পিপীলিকার মত বংশপরম্পরা মানুষ আসে যায়—মানুষের কি সাধ্য তোমার সমগ্র ঐশ্বরিকতা উপলব্ধি করে? তুমি কৃপা করিয়া একটু নিজকে প্রকাশিত করিয়াছ তাই আমরা তোমাকে জানি। আমরা চোখে যাহা দেখি, কাণে যাহা শুনি, তাহা কেবল অসংবদ্ধ, ছিন্ন ভিন্ন, তুমি আমাদের চৈতন্যরূপে আছ বলিয়াই আমরা দেশ কালের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অতীত সত্য জানিতে পারি। আমাদের স্মৃতি, বুদ্ধি, কল্পনা কিরূপে বিকাশ পাইয়াছে, কিরূপে আমরা সমগ্র জগৎ, স্থায়ী আত্মা ও তাহাদের সংযোজক পরব্রহ্ম তোমাকে ধারণা করিতে পারিতেছি, কিরূপে প্রকৃতিতে ও মানবসমাজে নিয়মের অভিব্যক্তি ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা চলিতেছে,—এসব কথা যখন ভাবি তখন বিস্ময়ে ভক্তিতে তোমার চরণে আপনি মস্তক অবনত হয়।

শৈশবের প্রেম ও আনন্দ তাঁহারই করুণার দান।

১৯১৫ ইং সন।

(১) জীবন দাতা তোমা হইতেই এ জীবন পাইয়াছি। যখন শিশু ছিলাম, তখন তোমার প্রেমই আমাকে লালন পালন করিয়াছে। আমার পিতামাতার মধ্যে তোমার অনন্ত প্রেম অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাঁহাদের মধ্যে মূর্ত্তি গ্রহণ করাইয়া প্রতিনিয়ত আমাকে স্নেহ দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিলে, সকল বিপদে রক্ষা করিয়াছিলে, নিদ্রায় জাগরণে আমার সঙ্গী ছিলে, রোগে দুঃখে বুকে লইয়া শান্তি দিয়াছিলে। তখন আমি তোমাকে জানিতাম না, কিন্তু আজ বুঝিতেছি পিতা মাতাকে যে ভালবাসিয়াছি, আমার হাসি, খেলা, গান তাঁহাদের হৃদয়ে যে আনন্দ দিয়াছে, সেই ভালবাসা, সেই আনন্দ তোমাতে পৌঁছিয়াছে। আমি না চাহিতে কত করুণার দান তুমি আমাকে দিয়াছ। জন্মিবামাত্রই ধরণী আমায় কোলে করিল, আলোক বাতাস আমায় আলিঙ্গন করিল, মাতৃস্তন্যের দুগ্ধ আমাকে অমৃতের আস্বাদ দিল। শৈশবে তোমার জগৎ আমার কাছে কত সুন্দর ছিল, কি আনন্দের ধারা ইহার বর্ণে গন্ধে রসে, ইহার পাখীর কলরবে, বৃক্ষে পত্রে পুষ্পে ঝরিয়া পড়িত, প্রেমের আলোকে তখন সকলি শোভাময়, সুখময় ছিল, সংসারের সকল মানুষই আমার আপন ছিল, পৃথিবী যেন আমাদের পরিবার ও গৃহ ছিল। চারিদিকে

প্রেম ও আনন্দ যে অজস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া আমাকে স্নাত করিত, আজ তাহা ভাবিয়া তোমার চরণে অসংখ্য প্রণিপাত করি।

প্রেমের স্বর্গীয় শক্তি।

(২) ভক্তি থাকিলে শক্তি বাড়ে। তোমাতে যাঁহাদের প্রীতি অনুরাগ, তাঁহাদের মতি গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন; তাঁহাদের জীবন নূতন আলোকে আলোকিত হয়। তোমার নাম প্রচারে তাঁহাদেরই যোগ্যতা আছে। একজন ভক্তের সংস্পর্শে আসিয়া সহস্র সহস্র নর নারী পরিত্রাণ পায়, তাহা ত আমরা দেখিয়াছি, ইতিহাসে পড়িয়াছি, লোকের মুখেও শুনিয়াছি। ঋষি যোগীরা ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপানেই বিভোর থাকেন। তোমার পূজায় তাঁহারা কি আনন্দ অনুভব করেন, কি স্বর্গীয় প্রেরণা লাভ করেন, কি অসম্ভব শক্তি তাঁহাদের আত্মাতে সঞ্চারিত হয়, সংসার কি সুন্দর হয়! প্রকৃতির পত্র পুষ্প, গ্রহ নক্ষত্র তাঁহাদের আত্মীয় হইয়া যায়। আমাদিগকে তুমি সেই প্রেম দাও, যে প্রেমে পৃথিবীর দুঃখ যন্ত্রনা এড়ান যায়, সকল আঘাতের ক্ষত জুড়াইয়া যায়, যে প্রেমে নিরাশা আশাতে, বিফলতা সফলতাতে পরিণত হয়, যে প্রেমে হৃদয়ে নূতন উৎসাহ, নূতন তেজ সংক্রামিত হয়, মানুষের সঙ্গে বন্ধন দৃঢ় হয়, সমাজে নূতন জীবন আনিবার সহায়তা হয়।

সর্ব্বজীবে সর্ব্বভূতে তোমার লীলা।

(৩) আজ প্রভাতের বিমল আলোকে তোমার প্রেমের আভাস পাইয়া আনন্দের উচ্ছ্বাসে হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছে। আজ তোমাকে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তোমার প্রকাশ দেখিতেছি। আজ আর শুষ্ক জ্ঞানের চর্চ্চায় তোমার স্বরূপের দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব না; আজ আর কবিত্ব কল্পনা দিয়া কেবল ভাষার পল্লবে ভাবকে ঢাকিয়া ফেলিব না। আজ তোমাকে সত্য জগতে সত্যভাবে দেখিব; প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে তোমার আনন্দের অভিব্যক্তি দেখিব; মানবের প্রেমে তোমার অনন্ত প্রেমের স্পর্শ পাইব; সমাজের বিচিত্র অনুষ্ঠানে তোমার মঙ্গলরূপ প্রতিষ্ঠিত দেখিব। আজ সকল জীবে, সকল ভূতে তোমার লীলা অনুভব করিব। মানুষ আর মানুষ নয়, তোমারই মূর্ত্তি গ্রহণ, তোমারি অবতার। শাস্ত্র প্রকাশিত সত্য ও প্রকৃতির বাহ্যরূপ আর মানবীয় বা প্রাকৃতিক নয়, তোমারই অতীন্দ্রিয়, অতি-প্রাকৃতিক আধ্যাত্মিক লোকের প্রকাশ। আজ আর নিজের দুর্ব্বলতা ও ধর্ম্মের অপব্যবহার দেখিয়া তোমার করুণার, তোমার সত্যতার বিষয়ে সন্দিহান হইয়া ধর্ম্মের কথা মানবসমাজে শুনাইতে পশ্চাৎপদ হইব না। আজ জীবনকেই তোমার প্রেমের জ্বলন্ত সাক্ষ্যরূপে দেখিব। আমরা যে জীবন ধারণ করিতেছি, তাহার মধ্যে কি তোমার মঙ্গল হস্তের ছাপ রাখ নাই? তুমি শুধু অন্ন জল, বাতাস আলোক দিয়া আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তে পুষ্ট

করিতেছ এমন নয়, তুমি শুধু শরীরের রক্ত চলাচল, নিশ্বাস প্রশ্বাস, খাদ্য পরিপাক প্রতিদিন নিয়মিত করিতেছ এমন নয় তুমি আমাদের জীবনের প্রত্যেক কাজ, প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক চিন্তা জানিয়া আমাদের তদনুরূপ ফল বিধান করিতেছ ও তোমার মঙ্গলরাজ্য স্থাপনের জন্য আমাদের জীবনকে এক অজ্ঞাত অদৃষ্ট ভবিষ্যতের দিকে লইয়া যাইতেছ। আমাদের সকল স্বার্থ কামনা, যত কলুষিত চিন্তা, যত বিরুদ্ধ ভাব, বৈষম্য বন্ধুরতা, তোমার বিশ্বজাগতিক মঙ্গল ইচ্ছার কাছে একদিন পরাজিত ও পরাহত হইবে। আমাদের চৈতন্য তোমার বিশ্বচৈতন্যের এক কণা মাত্র, আমাদের জ্ঞান তোমার অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রের একটি ফেনা মাত্র; তাই আমাদের অসত্য অন্যায় আচরণ এই চৈতন্য-ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ ও জ্ঞানের পরিধিকে সঙ্কুচিত করে। আমাদের প্রেম ও আনন্দ তোমারি বিশ্বব্যাপী প্রেম ও আনন্দের আঘাতে উথলিয়া উঠে, তাই আমরা সৌন্দর্য্যলোকে থাকিয়া ও প্রেম-আনন্দের হাওয়ায় বাস করিয়া সুস্থ হই, উন্নত হই। আকাশের গ্রহগুলি যেমন তোমার অঙ্গুলির ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, চক্রাকারে অনন্ত আকাশপথে পরিভ্রমণ করিতেছে, বনের ফুল যেমন তোমার অদৃশ্য তুলিকা স্পর্শে রঞ্জিত হইতেছে, তেমনি আমাদের জীবন তোমার ইচ্ছায় এক প্রেম পরিবারের দিকে মণ্ডলী গঠন করিয়া ধাবিত হইতেছে।

উপাসনার প্রভাবে জীবন বদলায়।

(৪) তোমার উপাসনা প্রতিদিন করি অথচ জীবনে কোন পরিবর্ত্তন আসে না ইহাও কি সম্ভব? আগুণের কাছে লোহা ধরিয়া রাখিলাম অথচ লোহা গরম হইল না, ইহা কি কেহ কখন দেখিয়াছে? জড়জগতে প্রত্যেক শক্তি আপনাকে সংরক্ষণ করিতেছে, এক আকার পরিত্যাগ করিয়া অন্য আকার ধারণ করিতেছে, অথচ আধ্যাত্মিক জগতের অজস্র প্রার্থনা, আরাধনা মনের উপর, হৃদয়ের উপর, জীবনের উপর কোনই চিহ্ন রাখিল না, কেবল অরণ্যে ক্রন্দনের ন্যায় শূন্যে উঠিয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গেল—ইহা যদি হয়, তবে তোমার সত্তার, তোমার করুণার কি নিদর্শন জগতে থাকিল? না, প্রভো, না; তুমি ত ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে অসংখ্য সাক্ষী রাখিয়াছ, কত 'জগাই মাধাই' তোমার নামে ত্রাণ পাইয়াছে, কত সল পল হইয়াছে, কত রত্নাকর বাল্মীকি হইয়াছে, কত পাপী সাধু ভক্ত হইয়াছে, তোমার আরাধনার প্রভাবে মুষ্টিমেয় সামান্য লোকের দ্বারা কত মহৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে, লোকে যাহা অসম্ভব মনে করিয়াছিল তাহা সম্ভব হইয়াছে, এমন আশ্চর্য্য ঘটনা সকল জানিয়াও আমরা নিরাশ হই, বিষণ্ণ হই কেন?

মঙ্গলশক্তি সকল বিরোধের মধ্যে মিলনের ঐক্যধারা অটুট রাখেন।

(৫) আমাদের আত্মার মধ্যে দুই বিরুদ্ধ শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, একটা নিজের ব্যক্তিগত কল্যাণের দিকে আর একটা তোমার দিকে, বিশ্বজগতের দিকে। এই দুই এর প্রথমটা যখন বলীয়ান্ হয় তখন আমরা স্বার্থপর হই, দ্বিতীয়টা যখন বলীয়ান্ হয় তখন আমরা সংসার-বিমুখ সন্ন্যাসী হই। এই দুই এর মধ্যে যখন সামঞ্জস্য হয় তখন শিশুর হাতে সূতা দিয়া বাঁধা বলের মত আমরা তোমাকে কেন্দ্র করিয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথে মণ্ডলাকারে আবর্ত্তন করি। এইরূপে যখন সমগ্র মানবসমাজ তোমার চারিদিকে মহামণ্ডলী গঠন করিবে, তখন জগতে প্রেম-পরিবার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

তুমি মঙ্গলময়, জগতের সৃজন ও বিনাশ, মানুষের জীবন ও মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, রোগ স্বাস্থ্য, সম্পদ বিপদ একই বৃন্তের দুটী ফুল। তোমার রুদ্র মূর্ত্তি ও মঙ্গল স্বরূপ একই সত্তার দুই বিভিন্ন অবস্থা, তাই আমাদের দেশে শিব ও কালীর সংযোগ সাধন করা হইয়াছে। সংসারে আমরা যতই পাপ তাপ, যুদ্ধ বিগ্রহ, রক্তপাত, দুর্ভিক্ষ মহামারী, অন্যায় অত্যাচার দেখিনা কেন, ইহার ভিতরে তোমার মঙ্গল ফুলটি প্রস্ফুটিত হইতেছে, সংসার সয়তানের রাজত্ব নয়, এখানে এক মিলনের ঐক্য ধারা বহিতেছে।

ধর্ম্মের মহিমা।

(৬) ধর্ম্ম জীবনসংগ্রামে প্রধান সহায়। যে জাতির মধ্যে ধর্ম্মভাবাপন্ন লোকের সংখ্যা যত বেশী, সেই জাতি তত শক্তিশালী। সেই জাতি অন্য জাতির সহিত সংগ্রামে তত জয়ী হয় ও যোগ্যতম বলিয়া উদ্বর্ত্তন করে। ধর্ম্ম মানবসমাজের ভিত্তি। ধর্ম্মের সুদৃঢ় পাহাড়ে মানবসমাজ স্থিতি করিতেছে; ধর্ম্মের পবিত্র হাওয়ায় মানবহৃদয়ের সকল সদ্ভাবের অঙ্কুর বিকশিত হইতেছে। ধর্ম্ম নিরাশের প্রাণে আলো দেয়, দুর্ব্বলকে বলীয়ান্ করে, নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ লোকদের অন্তরে নূতন তেজ ও নূতন উৎসাহ প্রবেশ করাইয়া দেয়। জীবনের কঠোর সংগ্রামে পরাজিত ও পতিত মানুষকে ধর্ম্ম উচ্চস্তরে তুলিয়া লইয়া যায়। রোগে সহিষ্ণুতা, বিপদে অভয়, শোকে সান্ত্বনা, দারিদ্র্যে সহায়তা এসকল ধর্ম্মের দান। যেখানে দুর্ব্বলের উৎপীড়ন, সবলের অত্যাচার, যেখানে অন্যায় অবিচার, যেখানে স্বার্থপরতা ও অহঙ্কার, ধর্ম্ম সেখানেই উদ্যতহস্ত ও বজ্রদণ্ড লইয়া ন্যায়, সত্য, প্রেম, পবিত্রতার মঙ্গলরাজ্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী। ধর্ম্ম সকল বিজ্ঞান ও দর্শনের জন্মদাতা। প্রকৃতি ও মানবাত্মার বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও সদ্‌গুণ দেখিয়া মানুষ যখন বিস্ময়ে অভিভূত হয়, যখন বিশ্বজগতের রহস্যের কোন মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে পারেনা, তখনি তাহার জিজ্ঞাসা প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে, তখনি মানুষ জ্ঞানের রাজ্যে অগ্রসর হয়। ধর্ম্ম নৈতিক

জীবনের শিকড়, ধর্ম্ম শিল্পকলার ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের মূল। ধর্ম্ম পৃথিবীকে আমাদের গৃহ, মানবজাতিকে এক পরিবার ও একমাত্র পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখায়।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব।

(৭) বৈষ্ণব ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থলবর্ত্তী রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্বন্ধে আমাদের অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে। আমরা একদিকে ভয়ানক কুৎসিৎ অপবিত্র আচরণকেও ভগবানের লীলা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করি, আর একদিকে মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা ভালবাসাকে কাম ও ভোগ বিলাসের অভিনয় বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করি। রাধা ও কৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কি না সন্দেহ; তাহারা যে ভগবানের আংশিক বা সামগ্রিক অবতার রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই তাহা সন্দেহাতীত। কিন্তু শুদ্ধ মানবীয় গণনা হিসাবে যদি বৈষ্ণব কবির কল্পিত এই প্রেমিক যুগলের জীবন আলোচনা করা যায়, তাহা হইলেও একথাটা স্বীকার করিতে হয় যে পৃথিবীর কোন জাতিতে, কোন ধর্ম্মে এমন প্রেমের ছবি কখনও অঙ্কিত হয় নাই। আমরা রূপকচ্ছলে এই রাধাকৃষ্ণের

প্রেমকে ভক্ত-সাধক ও ভগবানের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ রূপে কল্পনা করিতে পারি। কৃষ্ণের জন্য রাধার অপরিসীম ব্যাকুলতাকে কবি নানাইয়া বিনাইয়া বিচিত্রসুরে বিচিত্রছন্দে যেরূপ উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়াছেন, তাহার নিকট ভগবানের জন্য ভক্তের আকুল ক্রন্দন লজ্জা পায়। প্রেমের যতগুলি লক্ষণ—আসঙ্গ স্পৃহা, তন্ময়তা, বিরহের আর্ত্তনাদ, মিলনে আনন্দ, হারাই হারাই ভয়, সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় প্রিয়তমের রূপ দর্শন ও বর্ত্তমানতা উপলব্ধি, লজ্জা ভয় পরিত্যাগ, কলঙ্ক ও অপমানকে অঙ্গের ভূষণ করা, প্রিয়জনের সেবায় অনুরাগ, জীবন মন সমর্পণ—সকলি রাধার জীবনে উচ্চতম প্রকাশ লাভ করিয়াছে। আমরা যদি ভগবানকে এমন করিয়া ভালবাসিতে পারিতাম, তবে আমাদের জীবন সার্থক হইত। যাহারা কখন মানুষকে ভালবাসিয়াছে তাহারাই কেবল নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে এই রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। আমরা যাহাকে পাপ বলি, ব্যভিচার বলি, অভিসার বলি তাহা কেবল আমাদের লৌকিক গণনা ও সামাজিক ভাল মন্দ বিচারের মাপ কাঠিতে ওজন করিয়া। ভালবাসার স্বর্গীয় আস্বাদন সকল পাপকে বিধৌত করিয়া পবিত্র করিয়া মর্ত্তজীবনে দেবলোকের মধুরতা ও অমৃত বর্ষণ করে। ভালবাসার দিব্য দৃষ্টিতে মানুষ দেবতা হয়, মর্ত্ত্যদেহে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ প্রকাশ দেখা যায়,—যে প্রকাশ অনন্ত সৌন্দর্য্য, সরলতা, প্রেম ও মঙ্গলের উৎস। ভালবাসার স্পর্শে

ইহজীবনে স্বর্গের সংস্পর্শ লাভ হয়। এই ভালবাসার মিলনে সমগ্র জগতের সহিত আমাদের নিবিড় যোগ ও ঘনিষ্ঠতা সাধিত হয়।

ধর্ম্মের অভয় বাণী।

(৮) ধর্ম্ম আমাদের নিকট চিরকালই অসম্ভব কথা শুনাইয়া থাকে। ধর্ম্মের মূল সত্যগুলির প্রকৃতিই এরকম যে আমাদের সাধারণ জ্ঞানও বিশ্বাস হইতে ঊর্দ্ধে না উঠিলে তাহাদের উপলব্ধি সম্ভব হয় না। আমরা চোখে যাহা দেখি, কানে যাহা শুনি, হাতে যাহা ছুঁই,—তাহার বাহিরে, রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের অতীত আর একটা সত্তা আছে, আর একটা বস্তু ও জগৎ আছে, এই অতীন্দ্রিয় সত্তা স্বীকার না করিলে কোন ধর্ম্মই টিকেনা। আমরা চারিদিকে বিশ্বজগতের অসীমতা যত জানি আমাদের নিজের ক্ষুদ্রতা তত বাড়ে, অথচ ধর্ম্ম বলে আমরা সান্ত হইয়াও অনন্তের সহিত এক। আমরা বাহিরের প্রকৃতি দ্বারা শাসিত, প্রাকৃতিক শক্তিগুলির হাতে পুতুলের মত চালিত, আমাদের অন্তরের কুপ্রবৃত্তি ও দুরাকাঙ্ক্ষা পশুকে পর্য্যন্ত লজ্জা দেয়, অথচ ধর্ম্ম বলিয়াছে আত্মাই প্রকৃতির নিয়ামক ও বিধাতা, মানবই দেবতা হইবে। মানুষের উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝাবাত, বন্যা, ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত চলিয়া

যায়, কত মহামারী দুর্ভিক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণীর বিনাশ করে, অথচ মানুষ বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার গৃহ, অমঙ্গলের পশ্চাতে মঙ্গল হস্ত রহিয়াছে। কত টাইটানিক পাঁচ হাজার নরনারীসহ জলগর্ভে ডুবিয়া যায়, কত খনিগর্ভে শত শত শ্রমজীবিগণ রুদ্ধশ্বাস হইয়া প্রাণ হারায়, কত দামোদরের বন্যায় গ্রামের পর গ্রাম গরু, ঘোড়া, ধন সম্পত্তি হারায় ও জনমানবহীন হয়, কত যুদ্ধে বিগ্রহে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভ্রাতৃরক্তে ধরাকে কলঙ্কিত করে, কত চুরি ডাকাতি, স্বার্থপরতা, অন্যায় অত্যাচার, অবিচার প্রতিমুহূর্ত্তে পৃথিবীকে নরকের মত পঙ্কিল করিতেছে, অথচ মানুষ ক্ষীণকণ্ঠে সকল অমঙ্গলের উপরে এক পরম পিতার প্রেমময় ক্রোড়ের কথা বলিতে ছাড়ে না, সংসারে ভাবী স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন দেখিয়া মঙ্গলময়ের জয় ঘোষণা করিতে এক পদও পেছনে হটিয়া যায় না। আমাদের এ কেমন আস্পর্দ্ধা! কোন ভয়, কোন সংশয়, কোন বিপদ, কোন মৃত্যু, কোন আপাত দৃশ্যমান অমঙ্গল আমাদের অন্তরের গভীর স্থলে নিহিত ধর্ম্মবিশ্বাস টলাইতে পারে না। বরং ইহজীবনের সকল বিরোধ, সকল ক্ষতি, সকল পরাজয় আমরা অতীন্দ্রিয় লোকের, পারলৌকিক জীবনের মিলন, লাভ; জয় ও আশার আনন্দে ঢাকিয়া ফেলি।

প্রকৃত তপস্যা।

(৯) কেবল চারিদিকে আগুন জ্বালাইয়া, গায়ে ভস্ম মাখিয়া, মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যের কিরণে বসিয়া, অথবা দারুণ শীতের সময় আবক্ষ জলে ডুবিয়া, শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন করিলেই তপস্যা হয় না। আমাদের মধ্যে যারা প্রবৃত্তির কঠোর সংগ্রামে প্রতিদিন ক্ষতবিক্ষত হইয়াও বিশ্বাস হারান নাই, যাহারা প্রলোভনের সম্মুখে দাঁড়াইয়াও ব্যাকুল প্রার্থনার বলে পরাজয় স্বীকার করেন নাই, যাহারা সংসারের তাপে তাপিত হইয়া, সমাজের অপ্রেম ও উদাসীনতায় নিরুৎসাহে শীতল হইয়া, পরাজয় ও নিরাশা, উপেক্ষা ও অপমানের কালিমা গায়ে মাখিয়া, প্রতিকূল জগতের মধ্যে বাস করিয়াও ভগবানের নামে আপনাকে জুড়াইতেছেন—তাহারাও তপস্বী, তাহাদের সাধনা শারীরিক তপস্যা হইতে অনেক কঠিন। যিনি যে বিষয়ে সফলতা ও পরিপূর্ণতা আকাঙ্ক্ষা করেন তাহাকে সেই বিষয়ে তপস্যা করিতে হয়—যেহেতু তাহাকে বাহিরের বিচিত্র বিষয় হইতে নানামুখী চিত্তকে টানিয়া আনিতে হয়, অনেক আমোদ প্রমোদ ও ভোগবিলাস হইতে আত্মসংযম করিতে হয়, অনেক বিষয়ে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। এইরূপে কেহ বিদ্যার জন্য, কেহ অর্থের জন্য, কেহ যশের জন্য, কেহ বা মানের জন্য ঘোরতর তপস্যা করেন। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় তপস্বী তিনি, যিনি আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য সাধনা করেন।

ভগবান্ সর্ব্বগত।

(১০) যিশু বলিয়াছেন—"আমি ক্ষুধার্ত্ত ছিলাম তোমরা আমাকে অন্ন দেও নাই, আমি তৃষিত ছিলাম, তোমরা আমাকে জল দেও নাই, আমি রাত্রিতে গৃহহীন হইয়া তোমাদের দ্বারে আসিয়াছিলাম, তোমরা আমাকে আশ্রয় দেও নাই। * * *

তোমাদের মধ্যে হীনতম ভাইটিকেও যদি ক্ষুধার সময় অন্ন, পিপাসার সময় জল, বিপদের সময় সাহায্য না দিয়া থাক, তবে তোমরা আমাকেই অস্বীকার করিয়াছ, আমাকেই ফিরাইয়া দিয়াছ।" আমরা ধর্ম্মের কথা প্রতিদিন কত শুনি, ঈশ্বরকে দেখা, ঈশ্বরকে পাওয়া আমাদের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করি, অথচ আমরা এমনভাবে চলি যেন ঈশ্বর কোন্ সুন্দর স্বর্গে রহিয়াছেন, কোন্ মনোহর বেশ ধরিয়া একদিন আমাদের নিকট দেখা দিবেন, অথবা কোন প্রতিভাশালী মহাপুরুষের আকারে আমাদের মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইবেন। প্রকৃত জ্ঞান উন্মেষিত হইলে আমরা ভগবানকে এখনই, এখানেই সর্ব্বগত বিশ্ব-আত্মারূপে দেখিতাম। প্রত্যেক মানুষে তিনি প্রকাশিত, প্রত্যেক ঘটনায়, প্রত্যেক অবস্থায় আমরা তার সম্মুখীন হইতেছি—প্রত্যেক নৈতিক সংগ্রামে, প্রত্যেক প্রলোভনে তিনি আমাদের বিবেকবাণী শুনাইতেছেন, প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি আমাদের নিকট পূজা ও বলি দাবী করিতেছেন, তাঁহার পূর্ণতার আদর্শে আমাদের জীবন চালাইতে; দরিদ্রকে সাহায্য করিতে, প্রতিবেশীকে

ভালবাসিতে, স্বদেশ বাসীকে শিক্ষায় চরিত্রে উন্নত করিতে, রোগীকে শুশ্রূষা দিতে, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতকে অন্নবস্ত্র দিতে উপদেশ দিতেছেন। সকল উপদেষ্টা, শিক্ষক, জ্ঞানবীর, কর্ম্মবীর, ভক্তপ্রেমিকের মধ্যে তিনি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে মঙ্গলের দিকে, প্রেমের দিকে, সৌন্দর্য্যের দিকে, শান্তির দিকে, পবিত্রতার দিকে, আনন্দের দিকে, স্বর্গ-রাজ্যের দিকে চালাইতেছেন। অথচ আমরা বলি "তুমি আমাদের নিকট প্রকাশিত হও"।

নামের মাহাত্ম্য।

(১১) "গাওরে ব্রহ্মনাম", "নামে ধন্য হবে মানব জনম," "নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে"—অতি সত্য কথা। মানবের শৈশব হইতে পরমেশ্বরের নাম, পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার নামে মানুষ শান্তি পাইয়াছে, সান্ত্বনা পাইয়াছে, শক্তি পাইয়াছে। তাঁহার নামে মানুষের ভয় দূর হয়, বিপদ দূর হয়, পাপ তাপ দূরে যায়, নীরসতা চলিয়া যায়। তাই তাঁহার নাম এত মিষ্ট। আমরা যাহাকে ভালবাসি তাহার নাম আমাদের কাছে বড় প্রিয় হয়, তাহার নাম বড় সুন্দর লাগে, মধুর লাগে। ভগবানে আমাদের প্রীতি হইলেই যে কেবল আমরা তাঁহাকে মিষ্ট বলি তা নয়। তাঁর নামের সঙ্গে তাঁর স্বরূপের এত নিকট

সম্পর্ক যে নাম ও ব্রহ্ম এক বলিলেও চলে। তাঁহার নামই তাঁহার রূপ,—অন্য কোন মূর্ত্তি কল্পনা করার দরকার হয় না, করিলে অনিষ্ট হয়। অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ নামের মাহাত্ম্য প্রয়োগ করা যায় কিনা সন্দেহ।

ঈশ্বরের নাম যাদুমন্ত্র।

(১২) আমাদের দেশে মন্ত্রবলে অনেক ব্যাধির চিকিৎসা হয়, অনেক অলৌকিক ক্রিয়া সম্ভব হয় এরূপ বিশ্বাস। মন্ত্র আর কিছু নয় কতকগুলি কথার সমষ্টি; অনেক স্থলে কথাগুলির কোন অর্থ নাই, অথচ এই সকল কথার ভিতরে কেমন জোর আছে, মূল্য অনেক। আমাদের কবি, বক্তা, লেখকগণ যে জনসমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করেন তার মূলেও এই কথার মাহাত্ম্য। উপযুক্ত শব্দ নির্ব্বাচন ও শব্দের বিন্যাসই তাহাদের শক্তির তিন-চতুর্থাংশ। একই চিন্তা, একই সত্য কে কিরূপ ভাষায়, কে কিরূপ বাক্য রচনায় প্রকাশ করেন তার উপর ইহার কার্য্য-কারিতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। কিন্তু ঈশ্বরের নামে কি এক যাদুমন্ত্র আছে, এখানে আর দ্বিতীয় শব্দ বা বাক্যের প্রয়োজন হয় না। একি স্বর্গীয় প্রভাব! যুগে যুগে প্রত্যেক উন্নত জাতিতে কত ঋষি যোগী, কত সাধু ভক্ত এনামের মোহিনী বলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, ইহার মিষ্টতায়

ডুবিয়াছেন। ঈশ্বরের স্তুতি বন্দনায় মানুষের ভাষা যেমন উন্নত, যেমন সুন্দর সুমিষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে এমন কিছুতে নয়। বেদ উপনিষদ্ ভারতের, বাইবেল খৃষ্টীয় জাতিদের, কোরাণ মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ, কেবল অন্ধ বিশ্বাসের জন্য নয়; ইহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাব ও ভাষা কোন সাহিত্যে রচিত হয় নাই, আজও নয়—অথচ ইহাদের লেখক, বক্তা বা রচয়িতাগণ কেহই বড় পণ্ডিত ছিলেন না।—আজও রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি সমগ্র সভ্য জগৎকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে—অনুবাদেও সৌন্দর্য্য হারায় নাই। যদি ভারতবর্ষে জীবন থাকিত, মনুষ্যত্বের পূর্ণতা হইত, তবে রবীন্দ্রনাথের চরণে সকল মাথা লুটাইত--কারণ রবীন্দ্রনাথ আমাদের বেদ উপনিষদ্ ও বৈষ্ণব শাস্ত্রকে বর্ত্তমান কালের উপযোগী করিয়া নিজের সাধনার আলোকে সভ্য জগতের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। আজও পরমেশ্বরের নামের শক্তি অতুলনীয়, অসীম; ইহার মহিমা একটুও হ্রাস হয় নাই,—বরং যত আমরা সভ্যতার স্তরে উন্নীত হই, আমাদের জ্ঞান তত বাড়ে, ঈশ্বরের মহিমা আমাদের কাছে তত গৌরবান্বিত হয়, তত তাঁর নাম মধুরতর হয়। মানুষ এর চেয়ে বড় কাজ করিতে পারে না—তাঁর নাম প্রচার করা, তাঁর নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণ সকল কর্ত্তব্যের শ্রেষ্ঠ। জয় ব্রহ্মের জয়। "গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়"।

---

(১৩) ব্রহ্মোৎসবের মধ্যে তোমার কৃপা সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইলাম। তোমার প্রকাশে আজ জগৎ সুন্দর ; জীবন আনন্দে ভরা মনে হইতেছে। আজ তোমার প্রেম সত্যভাবে অনুভব করিতেছি। তোমাকে দেখা তোমাকে পাওয়া এখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত, চক্ষুর পলক ফেলার মত সহজ মনে হইতেছে। আর তোমাকে দৃশ্য জগতের অন্তরালে অদৃশ্য শক্তি রূপে, আমার মানসিক জীবনের পশ্চাতে চৈতন্যরূপে দেখিয়া মন সন্তুষ্ট হইতেছে না। এখন তোমাকে সকল বস্তুতে ও সকল বস্তুকে তোমার মধ্যে দেখা সম্ভব হইতেছে। চক্ষে যাহা দেখি, কাণে যাহা শুনি, রসনায় যাহা আস্বাদন করি, হস্তদ্বারা যাহা স্পর্শ করি, নাসিকা দ্বারা যাহা আঘ্রাণ করি সকলি তোমার প্রকাশ, তুমিই সকল জ্ঞানের জ্ঞেয় বস্তু, তুমিই সকল চিন্তার জ্ঞাতা, সকল অনুভূতির কর্ত্তা, তুমি যেমন অতীন্দ্রিয় জগতে অতীন্দ্রিয় সত্তা তেমনি এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতে, আমাদের সকল চোখে-দেখা হাতে-ধরা জিনিষে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে প্রকাশিত। তুমি অনন্ত বলিয়াই কোন সসীম বস্তুতে তোমাকে সমগ্রভাবে দেখিতে পারি না ; আমাদের সান্ত জ্ঞান এক এক স্থানে এক এক সময়ে তোমার বিশেষ বিশেষ স্বরূপের প্রকাশ দেখে, কিন্তু তুমি প্রত্যেক অণুপরমাণুতে সমগ্রভাবে, অনন্তভাবে বর্ত্তমান। যখনি সান্ত বস্তুকে সান্ত করিয়া দেখি ও মনে করি তুমি কোন বিশেষ পুরুষে, বিশেষ শাস্ত্রে বা বিশেষ মূর্ত্তিতে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছ, তখনি আমরা পৌত্তলিকতার অন্ধকারে ডুবি। প্রকৃত

জ্ঞান-চক্ষু ফুটিলে কেবল তুমিই জড় জীবনরে একমাত্র সত্য দেখি। তোমার সত্তায় আর সকল সত্তাবান, তোমার সত্তা-সমুদ্রে আর সমস্ত ডুবিয়া আছে। আর আমি সপ্তাহে একদিন তোমার নাম গান করিয়া সন্তুষ্ট থাকিব না, কেবল দিনের একটি নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টায় তোমার পূজা করিয়া তৃপ্ত হইব না। আমার সমগ্র জীবন, প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত এখন তোমার উপাসনা হইবে। যাহা কিছু করি, যাহা কিছু বলি, যাহা কিছু ভাবি, তুমিই তাহার লক্ষ্য ও নিয়ামক হইবে। তিল তিল করিয়া তোমার সেবায়ই আত্মবলিদান করিব। সকল প্রেমে তোমাকেই সম্ভোগ করিব।

তুমিই বন্ধু।

(১৪) যখন প্রেমাস্পদ বন্ধুকে বুকে ধরিয়া বাহু পাশে বাঁধিয়া আলিঙ্গন করিয়াছি, তখন তোমারি মধুর স্পর্শ আস্বাদ করিয়াছি। যখন প্রিয়তমের মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছি, তখন তোমারি স্বর্গীয় বাণী শুনিয়াছি, সকল পার্থিব সৌন্দর্য্যে তোমারই অনুপম রূপ দেখিয়াছি। সকল সুখে, সকল আনন্দে, সকল প্রেমে তোমারি ভালবাসা পাইয়াছি ; সকল দুঃখে, সকল বেদনায়, সকল আঘাতে, সকল পরাজয়ে, সকল নিরাশায়, সকল অপমানে তোমারি মঙ্গল হস্তের পরিচয় লাভ করিয়াছি। তুমি সকল অবস্থায় আমাদের বন্ধু।

দৈনিক জীবনে সংসারের কাজে তোমার উপাসনা।

(১৫) তোমার উপাসনা কেবল মুখের কথায় হইবার নয়—জীবনের দ্বারা তোমার পূজা করিতে হয়। আমরা তোমার উপাসনা করিতে হইলে কথা খুঁজি, কত বড় বড় বাক্য রচনা করি—আকাশ, পাতাল, পর্ব্বত, সমুদ্রে তোমার মাহাত্ম্য দেখি, মানবসমাজে ও প্রকৃতিতে তোমার সৌন্দর্য্য ও প্রেম প্রকাশিত দেখি, কিন্তু তুমি যেখানে সকলের চেয়ে বেশী নিকটে, যেখানে আমাদের উপর তোমার দাবী সকলের চেয়ে স্পষ্ট, সেখানে আমাদের দৃষ্টি, আমাদের চিন্তা পড়ে না। আমাদের দৈনিক জীবনে, পরিবারে আত্মীয় বন্ধুর সহিত ব্যবহারে, আমাদের ধর্ম্ম-সাধন কষ্টি পাথরের দ্বারা পরীক্ষিত হয়। আমরা নিজের মধ্যে যদি তোমার স্বরূপ দেখিতে না পাই, দেহের ও মনের সকল ব্যাপারে যদি তোমার হস্ত অনুভব না করি, স্মৃতি, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ও অধ্যাত্মচিন্তা যদি তোমার সহিত পরিচিত না করে, সংসারের সকল কর্ত্তব্যে যদি তোমার অলঙ্ঘনীয় আদেশ ও স্বর্গীয় শুভবুদ্ধির প্রেরণা না পাই, পরিবারের সকল মধুর সম্বন্ধে যদি তোমার প্রেম আমাদের হৃদয় স্পর্শ না করে, গৃহের সকল ব্যবস্থা, সকল শৃঙ্খলা যদি তোমার প্রতি ভক্তির পরিচয় না দেয়, তবে আমাদের উপাসনা কেবল বাক্যাড়ম্বর, আমাদের ধর্ম্ম অর্থহীন।

নামে রুচি ও নাম গান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

(১৬) প্রভো, তোমার নাম প্রচার করা, তোমার নাম শ্রবণ মনন ও ধ্যান করা, এর চেয়ে জীবের আর কি উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে? তোমার নামের চেয়ে বড় জিনিষ যেমন মানবের ভাষায় নাই, তেমনি তোমার নাম প্রচার করার চেয়ে বড় কাজ মানবের সমাজে নাই। মানবজীবনে ধর্ম্ম সাধন করা, ধর্ম্ম প্রচার করা সকলের চেয়ে বড় সেবা। আমরা শুনিয়াছি "নামে রুচি ও জীবে দয়া" ভক্তির ধর্ম্মের লক্ষণ। প্রভো, তোমার নামে রুচি, তোমাতে প্রীতি জন্মানই যে জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কেবল মুখে অন্ন দিলে, রোগে শুশ্রূষা করিলে, দরিদ্রের অর্থাভাব দূর করিলে, অন্ধকে চক্ষু, খঞ্জকে চলৎশক্তি দিলে ও সকল প্রকার শারীরিক সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিলেই কি ধর্ম্ম হয়? মানুষ ত কেবল রুটির দ্বারা বাঁচে না, শারীরিক অভাব মোচনের জন্য, জনসেবার জন্য, পরোপকারের জন্য ত রাষ্ট্রবিধান আছে, কত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন ও নীতিবাদী, হিতবাদী নাস্তিক আছেন, কিন্তু তোমার মহিমার জয়, তোমার নামের গুণ কীর্ত্তণ করিবার জন্য ত কেউ নাই। তোমার নাম যে দুর্ব্বলের প্রাণে শক্তি সঞ্চার করে, নীরস হৃদয়ে প্রেমের সরসতা আনিয়া দেয়, নিরাশকে আশান্বিত করে, জীবনকে বিষাদ, বিপদ, রোগ, যন্ত্রণা, শোক ও পরাজয়ের মধ্যে আনন্দে, উৎসাহে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়, তোমার নামে

যুগে যুগে দেশে দেশে কত অন্ধ চক্ষু পাইয়াছে। চর্ম্ম-চক্ষুহীন কয়টা লোক পৃথিবীতে আছে প্রভো! বোবা, বধির, খঞ্জদের চিকিৎসার জন্য, আশ্রয়ের জন্য ত কত রুগ্ন-শালা, আশ্রম-মুক্ত রহিয়াছে; কিন্তু আত্মার জগতে রুগ্ন, মোহান্ধকারে মগ্ন, ভগ্ন-পদ, স্বর্গের আদেশে বধির লোকের ত সংখ্যা নাই, তাহাদের জন্য ত তোমার নামের মত ঔষধ নাই। কত পাপী সাধু হইয়াছে, কত বন্দী মুক্ত হইয়াছে, কত তৃষ্ণার্ত্ত জল পাইয়াছে, কত উত্তেজিত আত্মা শান্তি পাইয়াছে—তোমার নামে। আমরা ধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করিয়া কি কেবল বাহিরের সত্তা, বাহিরের কর্ম্ম-চেষ্টা নিয়াই থাকিব? আগে তোমার নাম গান ও নাম দানে সিদ্ধ হই, আর সব পরে আসিবে।

ধর্ম্মের সাধনা অন্তরে ও নিজের ঘরে।

(১৭) ধর্ম্মকে যেন আমরা বাহিরের বস্তু করিয়া রাখিয়াছি, জীবনে ইহার প্রভাব তেমন দেখা যায় না। আমরা বাহিরে বিশাল সমাজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার ভার নেই, তাহার সকল হিসাব নিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে চাই, তাহার কোথায় কোন্ ত্রুটি, ছিদ্র আছে ধরিয়া ফেলি, সকল সভ্যের পাপ মলিনতা দূর করিতে চেষ্টা পাই, অথচ আমাদের নিজেদের জীবন শত গ্রন্থিযুক্ত, আমাদের নিজেদের ঘরে কত আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইয়াছে,

নিজের গৃহসজ্জায় কত ধূলি, কত বেমিল, কত বিশৃঙ্খলা, নিজের অন্তরে কত অশুভ কামনা রাজত্ব করিতেছে, তাহার কোন প্রতিকারের চেষ্টা নাই। ধর্ম্মসাধন ঘরেই আরম্ভ হওয়া উচিত। প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে শক্তি দিউন।

সত্যধর্ম্ম তেজস্বী ও বীর্য্যবান্ করুক।

(১৮) আমাদের ধর্ম্ম আমাদিগকে নিস্তেজ করে, কাপুরুষ করে, শান্ত ও নিরীহ করে। এখন খুব বীর্য্যবান্ উগ্র প্রতাপান্বিত ধর্ম্মের দরকার, যাহা আমাদের পুরুষত্বকে জাগ্রত করে, সাহস দেয়, সিংহের মত শক্তি দেয়। সকল প্রকার দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া যাহা সত্য, যাহা ন্যায়, তাহা তেজের সহিত প্রচার করিতে শক্তি দেয়, যাহা কিছু অশুভ ও অন্যায় তাহার বিরুদ্ধে ভীষণ সংগ্রাম ঘোষণা করিতে সমর্থ করে—এমন ধর্ম্ম চাই। যে ধর্ম্ম গড়িতেও জানে, ভাঙ্গিতেও জানে, সৃজন ও বিনাশকে একই আধ্যাত্মিক শক্তির দুইদিক্ মনে করে, যে ধর্ম্ম বিশ্বজনীন মঙ্গলকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, ন্যায়ের প্রেমের শান্তির আনন্দের স্বর্গরাজ্য আনয়নের জন্য, কোন নির্য্যাতন, কোন অপমান, কোন শারীরিক ও মানসিক কষ্টকে ভয় করে না, সকল প্রকার বিপদ ও অত্যাচারকে হাসিমুখে আলিঙ্গন করে, এমন কি প্রাণ-পর্য্যন্ত অকাতরে সত্যের মন্দিরে বলি দেয়—

এমন ধর্ম্ম আমাদের দেশে আসুক, আমাদের চিত্তকে স্বাধীন করুক, আমাদের দেহকে সুস্থ ও সবল করুক, আমাদের আত্মাকে সরস ও উন্নত করুক। হে মঙ্গলময়, তুমি আমাদের এই দুর্ভাগা দেশকে এই আশীর্ব্বাদ কর, এমন সত্য ধর্ম্ম এখানে প্রচার করিবার জন্য উপযুক্ত প্রতিভাশালী মহাপুরুষদের পাঠাও। আমাদের দেশ যে বৈশ্য ও শূদ্রে ভরিয়া গেল, আমাদের মধ্যে ব্রহ্মণ্য ও ক্ষত্রিয় শক্তিকে আবার জাগ্রত কর। আমাদের নর নারী ত্যাগ, সেবা, আত্মদানের পথে অগ্রসর হউন, বীর্য্য শৌর্য্য ও পৌরুষের ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হউন।

বিশ্বের সর্ব্বত্র অসংখ্য যাদুখেলা।

(১৯) তোমার মত জ্ঞানী কে ? অন্তহীন তোমার শক্তি, অসীম তোমার জ্ঞান। কি আশ্চর্য্য কৌশলে গ্রহ তারকাগুলিকে শূন্য পথে ঘুরাইতেছ, কি সূক্ষ্ম গণিতের নিয়মে প্রত্যেক বস্তুর গতি, স্থিতি, সংঘাত ও প্রতিঘাতকে চালাইতেছ! কি মহা সতর্কতার সহিত জড়-জগতে ও জীব-জগতে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছ, ও উচ্চ হইতে উচ্চতর শক্তির বিকাশ করিতেছ! তোমার মত এমন যাদুকর কে আছে ? মাটির সঙ্গে একটি বীজের কণা মিশাইয়া কি প্রকাণ্ড গাছ, কি সুন্দর ফুল, কি সুরসাল ফল প্রস্তুত করিতেছ! কি দুর্জ্ঞেয় রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে মাটির ধান, মাটির

ডাইল ও মাটির তরকারী আমাদের মাটির শরীর গঠন করিতেছে, রক্ত মাংসে পরিণত হইতেছে! কি আশ্চর্য্য এক একটি ফুল—এমন কোমল, এমন সুখস্পর্শ! কেমন করিয়া তুমি নিঃশব্দে নিরাড়ম্বরে ইহাকে মাটি হইতে উৎপন্ন ও বিকশিত করিলে! কি সুন্দর একটি তৃণ, কি মনোহর একটি প্রজাপতির পাখা! মানুষ কত শিল্প-বিজ্ঞানের বলে আজও এমন কল তৈয়ার করিতে পারে নাই, যাহা জীবদেহের মত, বৃক্ষলতার মত এমন সজীব, এমন কৌশলপূর্ণ, এমন কোমল, অথচ স্থায়ী ও স্বাভাবিক। আমরা ধর্ম্মের সত্যতার জন্য একটা কিছু অলৌকিক দেখিতে চাই, কোন অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চাই। হায়, অজ্ঞ মানুষ চোখ খুলিয়া দেখে না,—এই বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রতিদিন অসংখ্য যাদুখেলা, অসংখ্য ম্যাজিক, অসংখ্য মিরেকুল সম্পাদিত হইতেছে। মানুষের মনে যে এত হাসি, এত কান্না, এত ভাব, এত ইচ্ছা, এত জ্ঞান—এ কোথা হইতে আসে? মানুষের জীবনে কি তোমার অদ্ভুত লীলা প্রতিদিন দেখি না? প্রতিদিন যে তুমি অন্ধকে চক্ষু দিতেছ, খঞ্জকে চলিবার শক্তি দিতেছ, বধিরকে শুনাইতেছ, বোবাকে কথা বলাইতেছ। তোমার কৃপার স্পর্শমণি ছোঁয়াইয়া কত লোহাকে সোনা করিতেছ, কত পাপীকে সাধু করিতেছ এর চেয়ে বড় ম্যাজিক আর কি আছে? আমরা মল মূত্র বলিয়া যাহা পরিত্যাগ করি, তাহার মধ্য হইতেও তুমি স্বাস্থ্যকর, সুখাদ্য, সুপেয় প্রস্তুত করিতেছ। তুমি অনন্ত, তাই অনন্তভাবে তোমার প্রকাশ, তোমার কার্য্যপ্রণালী এমন

বিচিত্র, একই ঘটনা, একই শক্তি অসংখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে,—একই পথে দূষিত বর্জ্জন ও জীবনের অভিবাদন চলিতেছে।

অন্তরে বাহিরে তোমার আরতি ও পূজা।

(২০) বাহিরে যেমন চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ তারকা, বৃক্ষ লতা, ফুল ফল, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, পাহাড় পর্ব্বত, নদী সমুদ্র, সকলে মিলিয়া তোমার আরতি, তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, অন্তরে তেমনি আমাদের সকল ইন্দ্রিয়, সকল ইচ্ছা, ভাব ও চিন্তা মিলিত কণ্ঠে তোমার জয়গান করে, তোমার উপাসনা করে। আমার মন, আত্মা, হৃদয়, প্রাণ সকলি এই মহা পূজার গন্ধে আমোদিত হইতেছে, এই মহা সঙ্গীতের সুরে ঝঙ্কৃত হইতেছে। তুমি আমাকে এই পবিত্র আরতির স্পর্শে নির্ম্মল করিয়া দাও। তুমি যে বিশ্বরাজ, তুমি যে আমার মুনীব, আমি যে তোমার দাস, আদেশ-পালক ভৃত্য—এই অনুভূতি আমার হৃদয়কে পূর্ণ রাখুক। তোমার সেবা করিতে, তোমার আজ্ঞা জীবনে শুনিতে ও কার্য্যে পরিণত করিতে আমাকে শক্তি দাও। তোমার করুণা আমার সম্বল হউক।

তুমি আমার সকলি।

(২১) তুমি আমায ভাব দাও, ভাষা দাও, তবে আমি প্রার্থনা করিতে পারি, বক্তৃতা করিতে পারি, গান করিতে পারি, উপদেশ দিতে পারি, বক্তৃতায যোগ দিতে পারি। তুমি আমার সকলি, এই অনুভূতি যেন আমার নিত্যসঙ্গী হয়। তুমি সর্ব্বত্র রহিয়াছ, এই জ্ঞান যেন আমার প্রহরী থাকে। তুমি আমার সেবা চাহিতেছ, তুমি প্রভু, আমি ভৃত্য, এই ভাব যেন আমাকে সকল কর্ম্মে প্রেরণা দেয়। তুমি আমার মঙ্গলময় পিতা, জীবনের সকল কঠোরতা, সকল বিপদ, রোগ, শোক, সকল আঘাত, পরাজয, নিরাশা যেন এই চিন্তাটিকেই প্রবল করিয়া তুলে ও তোমার নিষ্ঠুর করুণার মধ্যে যেন বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আমার সকল সংগ্রহ, সকল সন্দেহ তুমি নির্ম্মম আঘাতে ভাঙ্গিয়া দাও, আমি ব্যক্তিগত জীবনে মরিয়া যাই, সামাজিক জীবনে নূতন জন্ম গ্রহণ করি, সমাজের মঙ্গলের সহিত নিজের সুখকে এক করিয়া দেখি।

আমার সকল অভাব তুমি জান।

(২২) তুমি আমার সকলি জান, তোমার বিধানেই সকল ঘটনা আসে, তবু কেন আমি এমন তীব্র অভিযোগ করি, তবু কেন আমি এত বিরক্তি প্রকাশ করি। আমি পড়িতে চাই, কাজ

করিতে চাই, এমন সময় যদি কোন অতিথি আসেন, কোন বন্ধু আসেন, বা শিশুদের সহিত কথাবার্ত্তায়, গল্পে আমোদে অনেক কাল কাটিয়া যায়, তবে ইহা আমাকে সহিষ্ণুতা, নির্ভর ও প্রার্থনার ভাবে অনুপ্রাণিত না করিয়া মনে মনে কষ্ট দেয় কেন? আমার সকল অভাব তুমি জান, আমার ভালর জন্য যাহা কিছু দরকার তাহা তুমি বিধান কর, আমি আর কোন কথা বলিব না, আমি নীরবে কেবল তোমাকে ভক্তি করিব। তোমার প্রেমে সকলের সেবা করিব। জীবনের কত ঘটনায় দেখিয়াছি, তুমি আমার সহায়, তুমি আমার সম্বল, তুমি আমার শান্তি, তুমি আমার সান্ত্বনা।

তুমি মাতৃরূপে নূতন ভাবে প্রকাশিত হও।

(২৩) মা, তোমার কাছে আমরা চিরকালই শিশু, আমাদের সকল অভাব তোমাকেই জানাইব; সকল অবস্থায় তোমার উপরই নির্ভর করিব, সকল বেদনায় তোমার কাছেই চোখের জল ফেলিব। তোমার কাছে আমরা ধূলা কাদা লইয়া ছুটিয়া যাইব; তুমি আমাদের ধূলা ঝাড়িয়া কোলে তুলিয়া লইবে, আমাদের সকল মলিনতা ধৌত করিয়া পবিত্রতার বসন পরাইয়া

দিবে। শৈশবে যেমন অজ্ঞ, দুর্ব্বল ছিলাম, মার কাছেই অন্ন জল পাইতাম, আজ আমরা সংসারের মার কাছে যতই বড় হই না কেন, আমাদের জ্ঞান ও সামর্থ্য যতই কেন বাড়ুক না, তোমার কাছে এখনও আমরা তেমনি অজ্ঞ ও দুর্ব্বল; ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, দেখিবার আলো, চলিবার শক্তি এখনও তোমার কাছেই পাই। তবে কেন আমরা শিশুর মত সরল হইতে পারি না, তবে কেন আমরা সংসারকে শৈশবের মত সুন্দর দেখি না, তবে কেন জীবনটা এমন নীরস, ও নিস্তেজ, কঠোর ও পুরাতন মনে হয়। তুমি আমাদের কাছে আবার মাতৃত্বের নূতন রূপ প্রকাশিত কর, আবার আমাদের পৃথিবীকে সরস, সতেজ, প্রেমানন্দ পূর্ণ ও নূতন করিয়া দেও, আমাদের লোহা ছুঁইয়া সোনা করিয়া দেও, জগতে তোমার যে অলৌকিক ভেল্কিবাজী চলিতেছে, তাহার প্রমাণ দেখাও।

বিশ্বচৈতন্যের অনুভূতি।

(২৪) পুরুষরূপী পরমেশ্বর, আজ সমুদয় বিশ্বে তোমার চৈতন্যের অভিব্যক্তি দেখিব, আজ আর জড় শক্তি আমাকে অন্ধ করিয়া রাখিবে না, আজ আর ইট পাথরের দেয়াল আমার চোখের সম্মুখে আবরণ ফেলিবে না। আজ তুমি জ্ঞানময়, ইচ্ছাময়, প্রেমময় পিতা হইয়া আমার নিকট প্রকাশিত হইয়াছ।

আকাশের বিচিত্র বর্ণ আমাদের জন্য তোমার সুন্দর খেলনার দান, প্রভাতের সূর্য্য কিরণ তোমার প্রেমমুখের হাসি, বিহঙ্গের কাকলী ও শিশুর সঙ্গীত তোমার সুমধুর ধ্বনি, মৃদুমন্দ সমীরণের প্রবাহে তোমার সুকোমল স্পর্শ। আজ গ্রহ নক্ষত্র হইতে ক্ষুদ্র তৃণ পর্য্যন্ত, মানুষ হইতে কীট পর্য্যন্ত তোমার প্রেমালিঙ্গনে বাঁধা। প্রকৃতির সকল ঘটনায় মানবসমাজের সকল অবস্থায় তোমার সুদূর-প্রসারিত অনন্ত জ্ঞানের ক্রিয়া, তোমার সকল-জয়ী মঙ্গলের শাসন। কোথাও অজ্ঞানতা, অন্ধতা, জড়তা নাই, কোথায়ও ন্যায় বিধানের চুলমাত্র ব্যত্যয় নাই। আমরা যাহাকে অচেতন জড়শক্তি বলি, তাহার মধ্যে তুমি মহাপ্রাণ, পরম চৈতন্য; আমরা যে জগতে অমঙ্গল অপূর্ণতা দেখি তাহা আমাদেরই অজ্ঞতা ও ইচ্ছাকৃত। মানবাত্মার জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, স্মৃতিতে, কল্পনায়, বিচিত্র ভাবে ও বিবিধ কর্ম্মে তোমারই বিশ্ব-চৈতন্য প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, উত্থান পতন, আশা নিরাশা, জীবন মৃত্যুর ভিতর দিয়া তুমিই লীলা করিতেছ। আমাদের সকল আঘাত, সকল বেদনা তোমার বিশ্বজীবনকে আহত করে, ব্যথিত করে; আমাদের কর্ত্তব্য পালন ও মহৎ অনুষ্ঠান তোমাকে গৌরবান্বিত করে। আমাদের আনন্দ তোমার হৃদয়ে শতগুণ আনন্দের সঞ্চার করে। মানবের ইতিহাসের সোপান ধরিয়া যতই অতীতের অন্ধকারে অগ্রসর হই, ততই দেখি যুগে যুগে তোমারি হস্তের, তোমারি অঙ্গুলির ছাপ রহিয়াছে। যেখানে সবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার

করিয়াছে, যেখানে নৃশংসের অবিচারে নর-শোণিত পাতিত হইয়াছে, যেখানে অন্যায় ও পশুবল ন্যায়ের উপর রাজত্ব করিয়াছে, যেখানে স্বাধীন মানবাত্মা বাক্যে, চিন্তায় ও কর্ম্মে সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়াছে, যেখানে অন্নাভাবে অনাহারে রোগে শোকে মানব-হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়াছে, সেখানে হে সকল-সহা সকল-বহা বিশ্ব দেবতা, সেখানে তোমার জীবন ছিন্ন ভিন্ন মলিন হইয়াছে, তোমার কোমল হৃদয় মর্ম্মাহত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তুমি সেখানে, যেখানে চাষী ভাই গ্রীষ্মের প্রখর সৌরতাপ ও বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারার মধ্যে ক্ষেত্রে লাঙ্গল টানিতেছে, তুমি সেখানে, যেখানে কুলি ভাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খনিতে পাথর কাটিয়া কয়লা উঠাইতেছে, মাটি কাটিয়া রাস্তা গড়িতেছে, যেখানে তাঁতি ভাই কাপড় বুনিতেছে। তুমি কখন ছিন্ন-বস্ত্র, জীর্ণ-দেহ, পক্ক-কেশ ভিক্ষুকের বেশে, কখন লাঞ্ছিতা, অপমানিতা, পতিতা, পরিত্যক্তা অসহায়া ব্যভিচারিণী রমণীরূপে মানবসমাজের দুঃখ বহন করিতেছ ও ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর সেবা গ্রহণ করিতেছ।

তুমি বিশ্বময়, বিশ্ব তুমিময়।

(২৫) চোখ বুঝিয়াই কি শুধু তোমাকে দেখিব? চোখ খুলিলেও ত তোমারি রূপ দেখি। এই যে বিশ্বজগৎ সম্মুখে প্রকাশিত, এই আকাশ, এই আলোক এত বিচিত্র বর্ণ, মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের খেলা, বৃক্ষ লতা, ঘর বাড়ী, ইঁঠ পাথর—এ সকল ত জড়ের সমষ্টি নয়, অন্ধ শক্তির মিলন ভূমি অথবা অণুপরমাণুর উন্মাদ নৃত্য নয়, এ যে তোমার দেহ, তোমার বিশ্বজীবনে অনুপ্রাণিত; তোমার মঙ্গল ইচ্ছা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তোমার নিঃশ্বাস জগৎকে রক্ষা করিতেছে, তোমার জ্ঞান প্রতিদিন ইহাকে নূতন করিয়া সৃজন করে—তুমিই এই বিশ্বে, এই বিশ্ব তোমাতে।

তোমার করুণা আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে

(২৬) মানুষ যেমন ইচ্ছা করিবা মাত্র তাহার হাত নাড়িতে পারে, পা চালাইতে পারে, চিন্তা প্রবাহকে নিয়মিত করিতে পারে, স্মৃতিকে জাগ্রত করিতে পারে যাহা অস্পষ্ট ছিল তাহাকে স্পষ্টতার সীমার মধ্যে আনিতে পারে, তুমিও তেমনি স্বাভাবিক জ্ঞান-বল-ক্রিয়া দ্বারা এই অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র হইতে ক্ষুদ্র তৃণ-গুল্ম

পর্য্যন্ত, তুচ্ছ জীবাণু হইতে বৃহৎ মানবসমাজ পর্য্যন্ত শাসন করিতেছ। নিতান্ত সহজ ভাবে, নিতান্ত অব্যবহিত রূপেই সকল ঘটনা, সকল অবস্থা, কি প্রকৃতিতে, কি চেতন জগতে—তোমার দ্বারাই নিয়মিত হইতেছে। আমাদের প্রার্থনা, আমাদের নির্ভরশীলতা আমাদের আত্ম-সমর্পণ, দীনতা তোমার ইচ্ছা-স্রোতের কেন্দ্র হইয়া ক্ষুদ্র দুর্ব্বল আমাদের দ্বারা অসম্ভব সম্ভব করায়, মহদনুষ্ঠানের সম্পাদন বিধান করে। আমরা ত কিছু করি না, আমরা কেবল তোমার হাতে নিজকে ছাড়িয়া দেই, আর তুমি অজ্ঞাতসারে আশ্চর্য্য কৌশলে সব করাইয়া লও। এইরূপে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে তুমি আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা, চক্ষুর পত্র-স্পন্দন, নাসিকার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, মাংস-পেশীর সঙ্কোচন প্রসারণ দ্বারা কত অচিন্তিত বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ, কত দূষিত পদার্থ শরীর হইতে বহিষ্কৃত করিতেছ, কত স্বাস্থ্যকর, সুখকর, কল্যাণকর বস্তুর গ্রহণ, অনুভব ও উপভোগ সাধন করিতেছে। তুমি আমাদের প্রেমময়ী মাতা, স্নেহময়ী ভগিনী, প্রেমাস্পদ বন্ধু হইয়া নানাদিকে নানাভাবে আমাদের প্রাণে আনন্দ, হৃদয়ে প্রেম, মস্তিষ্কে জ্ঞান, অন্তরে সৌন্দর্য্যবোধ, শরীরে স্বাস্থ্য ও আত্মাতে বীর্য্য প্রেরণ করিতেছ। তোমার করুণা যে আমাকে আপাদমস্তক ঘিরিয়া রহিয়াছে, কেমনে তোমায় ছাড়িয়া যাইব ?

তুমি আমার স্বামী।

(২৭) তুমি ত আমার সকল পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ। আমি ত সন্দেহ অবিশ্বাস কম করি নাই, তোমাকে আঘাত কম দেই নাই, কতবার তোমাকে ছাড়িয়া দূরে চলিয়া গিয়াছি, তোমাকে ফাঁকি দিলাম বলিয়া পলায়ন করিয়া নিজকে লুকাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কত ধূলা বালি গায়ে মাখিয়া, কত মলিনতা নাকে মুখে ঘসিয়া আপনাকে তোমার সন্তানের অযোগ্য করিয়াছি, কত বার তুমি আমার দ্বারে আঘাত করিয়াছ, আমি তোমাকে ফিরাইয়া দিয়াছি, কতবার তোমাকে নিদ্রিত মনে করিয়া তোমার শয্যার পাশ হইতে উঠিয়া ব্যভিচারিণীর মত আর একজনকে হৃদয়ে বসাইয়া আমোদ উপভোগ করিয়াছি। তুমি আমার সকল বুদ্ধি-বিচার, সকল দর্শন-বিজ্ঞান পরাস্ত করিয়া সকল মলিনতা ধৌত করিয়া, সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া, সকল আঘাতের ক্ষত জুড়াইয়া আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। এমন স্বাভাবিক ভাবে, এমন অজ্ঞাতসারে, তুমি একে একে আমার সকল জিনিষ কাড়িয়া লইয়া আপনার আধিপত্য আমার জীবনের সকল বিভাগে বিস্তার করিতেছ, আমি নিজেই দেখিয়া অবাক্ হই। কখন যে আমার হৃদয়পুরে তুমি প্রবেশ করিলে তাহা জানিনা, কখন যে আমি তোমার চরণে ধরা দিয়া বন্দী হইলাম তাহাও জানিনা, কেবল এটুকু জানি যে তুমি আমার স্বামী, আমি তোমারই প্রিয়তম।

তোমার সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিলে ধর্ম্ম নিষ্ফল।

(২৮) তোমার রাজ্যে এত সম্পদ, এত ধনরত্ন আছে অথচ আমরা তাহার ব্যবহার জানিলাম না। আমরা কেবল তোমার বিশ্ব-সাম্রাজ্যের নাম মাত্র উত্তরাধিকারী। তোমার ধন ঐশ্বর্য্য সিন্দুকে বন্ধ রহিয়াছে, আমরা তাহার চাবি অন্বেষণ করিলাম না। বানরের গলায় মুক্তার হার অর্থহীন শোভাহীন হয়, শিশুর হাতে সুকৌশলপূর্ণ যন্ত্র যেমন নিষ্ফল ও অনিষ্টকর হয়, তেমনি তোমার প্রকৃতি রাজ্য আমাদের অধিকারে থাকিয়াও আমাদের উপর আধিপত্য করিতেছে, আমাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের রাজ-সম্মান নিতান্তই অযৌক্তিক প্রমাণ করিতেছে। যদি তোমাকে প্রীতি করিয়া আমরা তোমার সম্বন্ধে, তোমার জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞই রহিলাম, যদি বিজ্ঞানে, দর্শনে, শিল্পে নিত্য নব সত্য আবিষ্কার না করিলাম, তবে কিসের ধর্ম্ম ?

তুমি আমার জীবনের কেন্দ্র হও।

(২৯) আমাকে আত্মসম্মান, আত্মনির্ভর ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিতে শিখাও। আমি যে প্রত্যেক বাক্যে, প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক চিন্তায় নিজেকে উচ্চ বা নীচ, বড় বা ছোট করিতেছি তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও। আমার আত্মা যে তোমার

মত অনন্ত ধর্ম্মী, তোমার সহিত এক, তুমি যে আমার সত্য, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ পরমাত্মা—তাহা অনুভব করিয়া, তাহার মর্য্যাদা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত চালাইতে শক্তি দাও। কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রিপু, অহঙ্কার, স্বার্থকামনা, ভোগ, লালসা, ছদ্মবেশে আমার কাছে তোমার আধিপত্য কাড়িবার চেষ্টা করে, কতবার আমি মোহের অন্ধকারে ডুবিয়া তোমার আসনে অন্যকে বসাইতেছি। আমাকে এ সকল মোহ প্রলোভন হইতে মুক্ত কর। আমি যে ক্ষুদ্র নই, আমি যে তোমার সন্তান, আমার ব্যবহারের গৌরব ও গাম্ভীর্য্য যেন তাহা প্রমাণ করে। যে শক্তি, যে মনোযোগ আমি অন্যের সন্তোষের জন্য, অন্যের মনোরঞ্জনের জন্য, অন্যের নিকট প্রিয় হইবার জন্য অর্পণ করি তাহার সমস্তই যেন তোমার সেবায়, তোমার চিন্তায়, তোমার জ্ঞানে ও তোমার ধ্যানে নিয়োজিত করি। তুমি এখন আমার জীবনের কেন্দ্র হও, আমাকে নীরব করিয়া দাও, তোমার লীলা তোমার করুণা যেন সর্ব্বত্র প্রকাশিত দেখি, আমাকে যেন সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারি।

নামকীর্ত্তনে আনন্দ।

(৩০) সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই তোমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। তোমার মহিমা নানা ভাষায় নানা বাদ্যের সঙ্গে মানব সমাজে সঙ্গীত হইয়াছে। তোমার স্তুতি বন্দনায় সকল যুগেই ধর্ম্ম জগতের সাধু ভক্তগণ আনন্দ পাইয়াছেন। তুমি যেমন মানুষকে প্রীতি কর, মানুষে আনন্দ পাও, মানুষও তেমনি তোমাকে প্রীতি করিয়া ধন্য হয়।

ধর্ম্মের শক্তি।

(৩১) যেখানে ধর্ম্ম সেখানে শক্তি, সেখানে আনন্দ, সেখানে জগৎ নূতন আকার ধারণ করে। ধর্ম্ম মানুষকে কবি করে, প্রকৃতিতে সৌন্দর্য্য দান করে, মানুষের মুখে প্রেমের জ্যোতিঃ ধরায়, সংসার সম্বন্ধে এক নূতন দৃষ্টি খুলিয়া দেয়। আমরা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া ক্লান্ত হই, ধর্ম্মের নামে দিনের পর দিন কত প্রার্থনা, কত সাধু অনুষ্ঠান করি তবু আমাদের শক্তি আসে না; যে শক্তি আমাদের ভাসাইয়া নিয়া যায়, সমগ্র সমাজকে এক উচ্চস্তরে তুলিয়া লয় সেই শক্তি আসেনা। আমাদের ধর্ম্ম একটা অনাবশ্যক অলঙ্কারের মত আমাদের গায়ে শোভা পায় না, অথচ কেমন এক সংস্কারের

বশবর্ত্তী হইয়া ইহার বোঝা বহন করিতেছি। যে ধর্ম্ম জীবনকে পুষ্ট না করে, জীবনে বল না দেয়, প্রেম ও সেবার ভাব জাগ্রত না করে, মহৎ আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত না করে, সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়, সে ধর্ম্ম কেবল ভাবুকতার উচ্ছ্বাস, কবির কল্পনা বা শুষ্ক জ্ঞানের চর্চ্চা।

মাঘোৎসবের প্রার্থনা।

১০ই মাঘ। ২৩ শে জানুয়ারী, ১৯১৮।

মাঘোৎসবের দ্বারে দাঁড়াইয়া তোমাকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণাম করি। এই উৎসব আমার নূতন জীবনের উৎস হউক। আমার ব্যক্তিগত জীবন বিশ্বজীবনে, শারীরিক জীবন আধ্যাত্মিক জীবনে প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হউক। আমাকে অনিয়ম হইতে নিয়মে, জড়তা হইতে নূতন জীবনে, আলস্য হইতে কর্ম্মব্যস্ততায়, মোহ হইতে জ্ঞানের আলোকে, শ্রান্তি হইতে বিশ্রামে লইয়া যাও। আমি নিজের সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি অগ্রাহ্য করিয়া তোমার সমাজের সেবায়, কলেজের সেবায়, ভাইভগিনী ও সন্তানদের সেবায় আত্মদান করি। আমার জীবন তোমার ধর্ম্মযজ্ঞের অগ্নিতে আহুতি দেই। আমাকে প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা দাও। প্রেমই আমার পরম তপস্যা হউক, প্রেমই আমার স্বর্গ, প্রেমই আমার ধর্ম্ম হউক। প্রেমের চক্ষে সকলকে সুন্দর দেখি, প্রেমের দ্বারা সকল জগৎ জয় করি।

উৎসবের অনুভূতি।

১১ই মাঘ। ২৪ শে জানুয়ারী, ১৯১৮।

আজ তুমি পুত্রকন্যাদের লইয়া উৎসব করিলে। আজ তুমি পাপা-তাপীদের তোমার প্রেমের বন্যায় ভাসাইলে। তোমার নাম কীর্ত্তন করিয়া, তোমার মহিমা শ্রবণ করিয়া, তোমার করুণার স্রোতে স্নান করিয়া আজ আমরা ধন্য হইলাম। আকাশের গ্রহতারকা তোমার নাম গাহিয়া নৃত্য করে, তুমি তাহাদের নাচের তালে তালে আমাদের হৃদয়কে মাতাইয়া তুলিলে। বাগানে পাখীরা তোমার যশ গায়, তুমি তাহাদের গানের সুরে আমাদের হৃদয় ভরিয়া দিলে। আজ আমরা তোমার সত্তা উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিলাম, আমাদের প্রাণের মধ্যে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ও রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে, শিরায় শিরায়, অস্থি মজ্জায় তোমার অস্তিত্ব দেখিলাম। তুমি যে আমাদের জননী, তোমার প্রেমে যে আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে জীবিত, তোমার প্রেমে যে আমরা পুষ্ট, তুমি যে আমাদের কোলে করে আছ, তোমার মধ্যে যে আমাদের সুখ শান্তি, আরাম ও আনন্দ, আজ তাহা অনুভব করিলাম।

তুমি মহোচ্চ পদসকলের নিয়ন্তা।

১২ই মাঘ। ২৫ শে জানুয়ারী, ১৯১৮।

আমার অন্তর বাহির তুমি পূর্ণ করিয়া রহিয়াছ। তোমাকে ছাড়িয়া আমার একটি পা ফেলিবার শক্তি নাই। একটি কথা বলিতে হইলে, লিখিতে হইলে, ভাবিতে হইলে, একটি নিঃশ্বাস ফেলিতে হইলে আমাকে তোমার দিকে চাহিতে হয়, অথচ আমি তোমাকে ভুলিয়া থাকি। তুমি মহোচ্চপদ সকলের নিয়ন্তা। তোমারই করুণায় আমি উচ্চপদ, মান, ক্ষমতা, ও যশের অধিকারী হই, যত দিন তোমার চরণে ভক্তি ও নিষ্ঠা থাকে ততদিন এ সকল আশীর্ব্বাদ উপভোগ করি। আর যখন তোমার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর হারাই, যখন অহঙ্কার, স্বার্থ, লোভ, মোহ আমাকে অবশ করে, তখন চারিদিকে সকল আশ্রয় ভাঙ্গিয়া যায়, কেবল মরুভূমির বালুকা ও শ্মশানের অগ্নি চারিদিকে ধূ ধূ করিতে থাকে, তুমি আমাকে যে কাজের জন্য এখানে আনিয়াছ, তাহা আমাকে দিয়া করাইয়া লও; আর যদি আমি ইহার যোগ্য না হই, তবে যোগ্যতর সন্তানকে এই পদে বসাইয়া দাও।

তুমি আমার গুরু।

১৩ই মাঘ। ২৬শে জানুয়োরী, ১৯১৮।

তুমি আমার গুরু, তুমি আমার জ্ঞানদাতা, শুভবুদ্ধিদাতা ধর্ম্মশিক্ষক। আমার সকল অজ্ঞতা সকল মোহের অন্ধকার তুমি দূর কর। তোমার কৃপায় আমার দিব্য দৃষ্টি খুলিয়া যাক্, তোমার স্বর্গীয় আলোকে আমার মনের সকল বিভাগ প্রকাশিত হউক। আমার জড়তা, আলস্য তুমি নাশ কর, আমার স্বার্থমুখীন দৃষ্টি তুমি অবরুদ্ধ কর, আমার জীবনকে সমাজের কল্যাণের দিকে, কলেজের কল্যাণের দিকে প্রসারিত কর। আমার অন্তরকে তুমি বিকশিত কর, ফুলের মত সুন্দর ও সুগন্ধ কর। হে আমার চিরদিবসের রাজা, চিরজীবনের দেবতা, এবার তুমি সম্পূর্ণরূপে আমাকে অধিকার কর। একটি বৎসর তুমি আমাকে সংযমের মধ্যে, নিয়মাধীনতার মধ্যে, কঠোরতার মধ্যে রাখ। আমাকে আগুনে পুড়াইয়া, লোহার শিকলে বাঁধিয়া, কঠিন পাথরে আঘাত দিয়া তোমার সেবক করিয়া লও।

উৎসবের নিমন্ত্রণ।

৮ই মাঘ। ২২শে জানুয়োরী, ১৯১৯।

তুমি আমাকে উৎসবের নিমন্ত্রণে আহ্বান করিয়াছ, আমি দীন মলিন বেশ লইয়া তোমার দ্বারে আসিয়াছি। তুমি আমাকে

তোমার পবিত্রতার সলিলে স্নান করাইয়া, প্রেমের বসন পরাইয়া, ভক্তির সুগন্ধ চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া, কৃতজ্ঞতার ফুলমালা হাতে দিয়া তোমার পূজারী বানাইয়াছ। তোমার একী লীলা! যার কিছু নাই, নিঃসহায়, নিঃসম্বল,* যার কেহ নাই, বন্ধুহীন, আত্মীয়হীন, যে সংসারের সংগ্রামে পরাজিত নিরাশ, ম্রিয়মাণ, সকলের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, তাহাকে তুমি ডাকিয়াছ, সকলের সম্মুখে তাহাকে তোমার আদর যত্ন উপহার দিতেছ, তোমার প্রেমমুখের স্নেহ-সম্ভাষণ দিতেছ, তোমার পাশে বসাইতেছ। ইহা হইতে আর কি সৌভাগ্যের বিষয় হইতে পারে? তোমার করুণা ধন্য, তোমার প্রেম ধন্য, তোমার লীলা ধন্য।

ভারতবাসীর গৌরব।

৯ই মাঘ। ২৩শে জানুয়ারী, ১৯১৯।

ভারতের নর নারীর পরম সৌভাগ্য যে তুমি এদেশে এত শাস্ত্র, এত গুরু, এত সাধু মহাপুরুষ প্রেরণ করিয়াছ; যুগে যুগে ঋষি যোগী মুনিদের দ্বারা এখানে উচ্চ ধর্ম্ম ও জ্ঞানের কাহিনী

শুনাইয়াছ; বুদ্ধ চৈতন্য নানকের সাহায্যে প্রেম ও সেবার শুভ বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছ; মুক্তির পথ দেখাইবার জন্য জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগের বিভিন্ন সাধন প্রকাশিত করিয়াছ। এ দেশের তপোবনেই তোমার চরণে মানবাত্মার প্রথম স্তুতিবন্দনা গীত হইয়াছে, এদেশের উপনিষদেই তোমার সত্তা, তোমার কর্ত্তৃত্ব, তোমার মহিমা ও তোমার মঙ্গলভাবের প্রথম মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে। এদেশের মাটিতে, হাওয়াতে, অন্নজলে, রক্তমাংসে তুমি ধর্ম্মবীজ ছড়াইয়া রাখিয়াছ। এদেশের সামান্য ধূলিকণাও তোমার জয় গান করে। এখানকার সমাজচালনায় ও রাষ্ট্রশাসনে তোমার মঙ্গলরাজ্যের, স্বর্গরাজ্যের আদর্শ প্রথম প্রকাশিত করিয়াছ।

জনদেবতা তুমি।

১০ই মাঘ। ২৪শে জানুয়ারী, ১৯১৯।

নবযুগে নবধর্ম্মের প্রেরয়িতা তুমি, প্রতিষ্ঠাতা তুমি, প্রচারক তুমি। তোমার সত্য তুমি নানা দেশে, নানা যুগে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত কর। এতদিন আমরা সুধী ও পণ্ডিতদের কাছে, ঋষি মুনিদের কাছে, সাধু ভক্তদের কাছে ধর্ম্মের কথা শুনিয়াছি; এখন আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যে, জন সমাজের মাঝে ধর্ম্মের নূতন প্রকাশ দেখিতে পাই। তুমি জনমণ্ডলীর অধিনায়ক, জন-চিত্তহারী,

জন-সংঘের চালক, পালক ও রক্ষক। তুমি দীন মলিন পাপী তাপী সন্তানদের মুখ দিয়া তোমার অমৃত নাম, তোমার মধুর নাম শুনাইতেছ; তাহাদের অন্তরে তুমি স্বাধীনতার, শিক্ষার, ন্যায়ের, মৈত্রীর, সাম্যের উচ্চ আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা জাগাইতেছ; তাহাদের দৈনিক জীবনের শান্তি, প্রফুল্লতা, স্ফুর্ত্তি ও উদ্যমের ভিতর দিয়া তুমি আপনাকে প্রকাশ করিতেছ। এবার তুমি কৃষিক্ষেত্রে, বস্ত্র-বয়নে, কারখানায়, শিল্পশালায়, বিদ্যালয়ে ও সামাজিক হিতানুষ্ঠানে ধর্ম্মমন্দির স্থাপন করিতেছ।

পুত্র যদি কুপুত্র হয়, তুমি কখনও কুমাতা হও না।

১২ই মাঘ। ২৬শে জানুয়ারী, ১৯১৯।

প্রাণ হইয়া তুমি শরীরকে অনুপ্রাণিত করিতেছ, অন্ন জলকে রক্ত মাংসে পরিণত করিয়া এই ধূলি মাটির উপাদানের মধ্যে জীবনীশক্তি প্রেরণ করিতেছ। বুদ্ধি হইয়া, চৈতন্য হইয়া তুমি আমাদের মনকে অনুপ্রাণিত করিতেছ, জ্ঞান বিজ্ঞানে পুষ্ট করিয়া দর্শনে ও তত্ত্ববিদ্যাতে উন্নত করিতেছ, মনের রাজ্যে তোমার জ্যোতি বিস্তার করিতেছ। পরমাত্মা হইয়া তুমি আত্মার জীবনকে

আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান্ করিতেছ; আত্মার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করার জন্য সত্যান্ন, প্রেমান্ন, শান্তির সুশীতল জল বিধান করিয়াছ; আত্মার স্নানের জন্য পবিত্র তীর্থের ব্যবস্থা করিয়াছ; সাধুভক্ত ঋষি মুনিদের আমাদের চালক ও নেতা করিয়াছ; বেদ উপনিষদ, স্মৃতি পুরাণ, তন্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র, বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ দ্বারা আমাদের আত্মার অন্ধকার দূর করিতেছ। জ্ঞানের জ্যোতিতে তুমি অনন্ত, আত্মার অগম্য হইয়া আমাদিগকে অভিভূত কর। তোমার মহিমার কোথায় আরম্ভ, কোথায় শেষ জানিনা। যেদিকে চাই সেদিকেই সকল দেশে, সকল কালে, প্রতি অণুপরমাণু, প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রতি ঘটনা, প্রতি অবস্থা পূর্ণ করিয়া তুমি সত্য। প্রেমের দৃষ্টিতে তুমি সুন্দর, আনন্দময়, মঙ্গলময, স্নেহময়। প্রেমে জগতের সৃষ্টি, প্রেমে জগতের স্থিতি, প্রেমের ধারা চন্দ্র কিরণে, ফুলের গন্ধে, পাখীর গানে, নদীর কল কল তানে, ঝরণার গম্ভীর ঝঙ্কারে, পর্ব্বতের উচ্চতায়, সমুদ্রের গভীরতায়, সমতলের শ্যামলতায়, আকাশের নীরবতায়। তোমার প্রেম আমাদের জীবনের সকল আনন্দে,হাসি খেলায়, নৃত্যে গানে, যৌবনের প্রেমে, উচ্চ আশায়, শৌর্য্যে বীর্য্যে, বার্দ্ধক্যের প্রবীণ অভিজ্ঞতায়, সংযমে, ধর্ম্মবলে, বিশ্বাসে ও ভক্তিতে। উপরে নক্ষত্রকে যেমন তুমি চালাও, মানুষের জীবনকেও তেমনি চালাও। কোন্ অনির্দ্দিষ্ট অজানিত গন্তব্যের দিকে মানবসমাজের ঘটনা সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছ তুমিই জান; বাগানের ফুলকে যেমন তুমি ফুটাও, মানুষের আত্মাকেও তুমি তেমনি সুগন্ধে সৌন্দর্য্যে

সুশোভিত করিয়া তুমি প্রস্ফুটিত কর,—কোন্ আশ্চর্য্য কৌশলে ও রহস্যময় নিয়মে তুমিই জান। তোমার মঙ্গল ইচ্ছা জগতের সকল ঘটনায়, প্রকৃতির সকল নিয়মে, সমাজের নীতি ও ব্যবস্থায়, প্রথা ও দেশাচারের বিকাশে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা একটু তার আভাস পাইয়া ধন্য হই। ন্যায়ের জন্য সংগ্রামে, সত্যের অন্বেষণে, পবিত্রতার সাধনে তুমি আমাদের অধিনায়ক, তুমি সহায় ও বলদাতা, অভয়দাতা। প্রেমময় পিতা তুমি, সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া পাপ থেকে বাঁচাও। আমাদের শিক্ষার উন্নতির ব্যবস্থা তুমি কর; জ্ঞানদাতা গুরু হইয়া তুমি নিত্য নূতন সত্য শিখাও; নূতন প্রেমের সাধনে ব্রতী কর। স্নেহময়ী জননী, আমরা কুপুত্র, কিন্তু তুমিত সুমাতা। সংসারে অনেক অধম পতিত পাষণ্ড সন্তান দেখা গিয়াছে,—মাকে নির্য্যাতন করে, কষ্ট দেয়,—এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি, শুনিয়াছি; কিন্তু মা ছেলেকে পরিত্যাগ করিয়াছে এমন হয় নাই, হইতে পারে না। আমরা যতই মলিন, যতই দুর্ব্বল, যতই পাপী ও বিপথগামী হই না, তুমি আমাদের পরিত্যাগ করিবে না, তুমি আমাদের পেছনে পেছনে ছুটিবে, হাত ধরিয়া ফিরাইবে, অশ্রু জল মুছাইবে, তোমার করুণায় আমরা মুক্তির অধিকারী হইয়া পরিত্রাণ পাইব। পরম পতি তুমি, তোমার প্রেম অতি আশ্চর্য্যরূপে গোপনে আমাদের হৃদয়ে কাজ করে। সতী নারী যেমন স্বামীকে দেবতা জানিয়া পতিব্রতা হইয়া স্বামীর সেবা করে, ভক্ত সাধু ঋষি যোগীরা তেমনি তোমার প্রেমে বিভোর হইয়া, তোমার চরণে মতি রাখিয়া জীবনে তোমার কাজ করেন।

তাঁহাদের প্রতি তোমার প্রেম স্বাভাবিক, তাঁহাদের সঙ্গে তুমি লীলা করিবে, এতো কিছু নয়; কিন্তু যারা অসতী রমণীর মত উপপতির সহিত অবৈধ প্রেমে আবদ্ধ, সংসারের অসার অনিত্য বিষয়ের মোহে অন্ধ হইয়া তুচ্ছ ধন মান পদের নিকট আপনার সম্মান বিক্রয় করিয়াছে, যাহারা প্রলোভনে বন্দী হইয়া পাপের গভীর পঙ্কে মগ্ন হইয়াছে, তাহাদের দ্বারেও তুমি প্রেমের ভিখারী, তাহাদেরও তুমি আলিঙ্গন কর, বাহুপাশে আবেষ্টন কর, তাহাদেরও তুমি প্রেম দাও, তাহাদের কুপথ হইতে ফিরাইবার জন্য তুমি রাত দিন মিনতির সুরে বীনা বাজাও, ইহার চেয়ে বিশ্বজয়ী প্রেমের প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

জাতিগঠন তোমার মঙ্গল বিধান।

১৩ই মাঘ। ২৭শে জানুয়ারী, ১৯১৯।

জাতি সকলের নিয়ন্তা তুমি। হিন্দু, য়িহুদী, পারসী, খৃষ্টান, মুসলমান সকল জাতির ইতিহাসে তোমার মঙ্গল বিধান প্রকাশিত হইতেছে। তোমার ন্যায়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তুমি জগতে জাতি গঠন কর। যে জাতি স্বর্গ রাজ্যের আদর্শের যত নিকটে, সেই জাতি তত উন্নত, তত সবল, তত স্থায়ী হয়; আর যে জাতি ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া, অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

করিয়া আপনাকে বড় করিতে যায়, সেই জাতি দুদিনের গৌরবে, দুদিনের ঐশ্বর্য্যে স্ফীত হইয়া ধূলিতে মিশাইয়া যায়। তুমি আত্মার বিকাশের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্ন হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে মন, মন হইতে বিজ্ঞান, ও বিজ্ঞান হইতে আনন্দের ধারা প্রবাহিত করিতেছ। আত্মাই জগতের মূল লক্ষ্য, আত্মার বিকাশই ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের মূল লক্ষ্য, আত্মা হইতেই শক্তি, আত্মা হইতেই ধন, আত্মা হইতে শৌর্য্য ও বীর্য্য।

নব যুগের নব ধর্ম্ম।

১৪ই মাঘ। ২৮শে জানুয়ারী, ১৯১৯।

বর্ত্তমান যুগে নূতন ধর্ম্মের বিধাতা তুমি। ঋষি যোগীদের ধর্ম্ম অরণ্যে সাধনের বস্তু; সে ধর্ম্ম আমাদের জন্য নয়। সংসারের গৃহে পরিবারে থাকিয়া, আফিসে আদালতে, কল কারখানায়, বিদ্যালয় ও হাসপাতালে কাজ করিয়া, শস্যক্ষেত্রে লাঙ্গল টানিয়া, রৌদ্র বৃষ্টিতে জমি চাষ করিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, শ্রমজীবীর মজুরী করিয়া, কামার কুমার ধোপা নাপিত তাঁতি সূতারের সঙ্গে, মুচি মেথর জেলে ভাইএর সঙ্গে খাটিয়া, যদি তোমার নাম গান করিতে পারি,

তোমার সেবার আনন্দে বিভোর হইতে পারি, তবেই আমি ধন্য হইব। তুমি জনগণ নায়ক, প্রজাপতি, আমরা জনসেবায়; প্রজা সাধারণের উন্নতিতে, তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষায়, পানীয় জল সংশোধনে জীবন নিয়োজিত করিতে পারিলে, তাহাদের জন্য বিশুদ্ধ হাওয়া, ভেজাল-রহিত খাদ্য, শীতগ্রীষ্মোপযোগী বস্ত্র, পারিবারিক আরাম ও সুস্থজীবন-ধারণোপযোগী আবাস গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদির সুব্যবস্থা করিতে পারিলে তোমার স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে আসিবে। তাহাদের প্রাণে শিক্ষার আলোক, ধর্ম্মের হাওয়া ও ভক্তির উষ্ণতা লাগিয়া হৃদয়ের ফুলটি বিকশিত হইবে; সকল নরনারী মনের স্ফূর্ত্তিতে আনন্দে স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া স্বাধীন ইচ্ছা লইয়া তোমার মন্দিরের যাত্রী হইবে, তোমার ধর্ম্ম সাধনের জন্য মণ্ডলী গঠন করিবে। এই নবযুগের নব ধর্ম্ম তুমি নব্যশিক্ষিত যুবকদের আত্মাতে প্রকাশিত কর। এই নব ধর্ম্মের অনুশাসনে প্রতিদিনের জীবনে আশার আলোক, বিবেকের বাণী, বিশ্বাসের দৃষ্টি, প্রেমের অমৃতরস, আনন্দের সুগন্ধ ও সেবার কোমল স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হই। প্রতিমুহূর্ত্তকে তোমার জীবন্ত বর্ত্তমানতা দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেখি; শান্তি, সদ্ভাব, শুভাকাঙ্ক্ষা, প্রীতি ও শ্রদ্ধার আতিশয্য দ্বারা সংসারের সকল অপবিত্রতা, অশুভ অনুষ্ঠান, বাক্য ও চিন্তা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলি; প্রেমের স্রোতে সকল কলহ বিবাদ, ভেদ বিরোধ, হিংসা দ্বেষ, মনোমালিন্য ভাসাইয়া নেই।

সময়ানুবর্ত্তীতা, পরিচ্ছন্নতা, মিতব্যয়িতা, ক্ষুদ্র বিষয়েও পূর্ণতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র পাঠ ও সভাসমিতিতে যোগদানকে ধর্ম্মসাধনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লই।

সর্ব্বভূতে পরমাত্মা

১৭ই মাঘ। ৩০শে জানুয়ারী, ১৯২০।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ (গীতা ৬।২৯-৩১)

"যাঁহার আত্মা যোগযুক্ত, তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আত্মাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ও সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করেন। যিনি আমাকে (অর্থাৎ পরমাত্মাকে) সকল বস্তুতে ও সকল বস্তুকে আমার মধ্যে দেখেন, আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করি না। যিনি আমার সহিত একীভূত হইয়া, আমাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত জানিয়া ভজনা করেন, সেই যোগী যেখানেই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থান করেন।"

এই কয়েকটী শ্লোকের মধ্যে গীতাকার ব্রহ্মজ্ঞানের সারতত্ত্ব ও চরম সাধনার বর্ণনা দিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের যদি কোন সার্থকতা থাকে, তবে এই আদর্শকে জীবনে উপলব্ধি করা এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে ইহাকে বাস্তবে পরিণত করিবার সাধনাই প্রত্যেক ব্রাহ্মের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে ও পরমাত্মার মধ্যে সর্ব্বভূতকে দেখাই সত্য দেখা। আমার মধ্যে অনন্তের প্রকাশ ও অনন্তের মধ্যে আমার বাসগৃহ—একথা শুধু মুখে বলা ও চিন্তাতে ধরিবার জন্য নয়, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি অবস্থায়, প্রতি ঘটনায়, প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিবার ও অপরের প্রাণে অনুভব করাইবার জন্যই ব্রহ্মোৎসবের আয়োজন। উৎসবান্তে আমরা সকলে অন্তরে প্রবেশ করিয়া অন্তরাত্মার সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করিয়া বিশ্বভুবনে তাঁহার সত্তা ও চৈতন্যকে প্রসারিত দেখিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত ভক্তি বিনয়ে মস্তক অবনত করি ও বলি, "যে ধন স্বর্গের দেবতাদের বাঞ্ছিত, ঋষি যোগীদের তপস্যার ফলে, মহাত্মা রামমোহনের সাধনায় তাহা মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া পাপীতাপীদের উদ্ধার করিল—ইহাই ব্রহ্মকৃপার জ্বলন্ত প্রমাণ; জয় করুণাময়, তোমারি কৃপার জয়, তোমার প্রেম ধন্য!"

জগতে অনেক বড় বড় আবিষ্কারের কথা শুনিতে পাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে আর্কিমিডিসের সম্বন্ধে এরূপ লিখিত আছে যে স্নানাগারে জলে ভাসিতে ভাসিতে এক নিমিষের মধ্যে বহু আলোচনার দ্বারা অমীমাংসিত একটি সত্যনিয়ম তাঁহার প্রাণে প্রকাশিত হইল; তিনি সেই সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়া "পেয়েছি" "পেয়েছি"

বলিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে উলঙ্গ অবস্থায়ই স্নানাগার হইতে বাহির হইয়া আপনার আবিষ্কৃত তত্ত্বের কথা জগতের লোককে শুনাইতে ছুটিলেন। এইরূপ কলম্বসের নূতন মহাদেশ আবিষ্কার ও নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার তাঁহাদের নাম পৃথিবীর জ্ঞানবিস্তারের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ ও স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। মানবজাতির ইতিহাসে ভারতের ঋষিরা যে এক অভিনব আবিষ্কার করিয়াছিলেন—যে আবিষ্কারের জন্য চিরকাল ভারতের সভ্যতার ও সাধনার কীর্ত্তি অমর হইয়া থাকিবে, যে জন্য আমাদের প্রত্যেকের শিরায় শিরায় গৌরবের দীপ্তি বৈদ্যুতিক প্রবাহের মত সঞ্চারিত হওয়া উচিত—সেই আবিষ্কারের কথা কয়জন জানেন ও ভাবেন? যেদিন এক সুন্দর শুভ্র প্রভাতে উদার নীলাম্বরের নিম্নে দাঁড়াইয়া ভারতের ঋষি ধ্যানযোগে পরমদেবতার পবিত্র সত্তাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া, আপনার আত্মাকে অনন্তের মধ্যে ও অনন্তকে আপনার আত্মাতে ও সর্ব্বভূতে প্রকাশিত দেখিয়াছিলেন, সেদিন জগতের ইতিহাসে এক বিশেষ দিন। ভারতের ধর্ম্মজীবনের ধারা সেদিন স্বর্ণকিরণে মণ্ডিত হইয়া অক্ষয় অমর চির পুরাতন অথচ চিরনূতন পরম পুরুষের বিশেষ আশীর্ব্বাদলাভ করিয়া মানব জাতির মুক্তির পথ প্রস্তুত করিবার জন্য শুভযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল। সেদিন ভারতের তপোবনে ব্রহ্মর্ষি আপনার অনির্ব্বচনীয় আবিষ্কারে আপনি স্তব্ধ হইয়া, একী গভীরমন্ত্রে আকাশ বাতাস ঝঙ্কৃত করিয়া, আনন্দের রাগিণীতে চারিদিক পূর্ণ করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "শৃণ্বন্তুবিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা আ যে

ধামানি দিব্যনি তস্থুঃ"। "ওগো দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা শোন"। একী আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সেই ঋষি স্বর্গের দেবতাও মর্ত্ত্যের মানুষকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ।"

"আমি সেই মহান্ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে জানিয়াছি—যিনি তিমিরের পরপারে বিরাজমান, তাঁহাকে জানিয়া মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, অন্য পথ নাই।" সেদিন সত্য সত্যই স্বর্গ মর্ত্ত্যের ব্যবধান ভাসিয়া গেল, মানুষ দেবতার সহিত এক আসনে বসিবার অধিকার পাইল। জগতের ইতিহাসে যত আবিষ্কারের কাহিনী আমরা জানি, তার মধ্যে মানবাত্মাতে অনন্ত ব্রহ্মের এই সাক্ষাৎ অনুভূতি সকলের শ্রেষ্ঠ, অভিনব, অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার। ভারতের ললাটে মঙ্গলবিধাতা যে এই গৌরবের দীপ্তি অমর করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে কতখানি সাধনা, কতখানি তপস্যা, কতখানি ত্যাগ ও নিষ্ঠা সঞ্চিত ছিল, আজ আমাদের ভাবিবার ও নীরবে কৃতজ্ঞচিত্তে অনুভব করিবার দিন। এই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুভূতির ফলে মানব জাতির চিন্তা, ধর্ম্ম, নীতি কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যপ্রতিষ্ঠার সোপান-পরম্পরা কতদূর প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা কি আর পরিমাণ করা যায়? ধন্য আমরা, এই পুণ্যভূমিতে এমন পুণ্যপুরুষদের আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াছি—যে ভূমিতে কত মহর্ষি মহাপুরুষেরা ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মের অদ্বিতীয়, সত্য, জ্ঞান, অনন্তরূপ,

তাঁহার আনন্দ, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য কেবল জীবনে আস্বাদন ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন এমন নয়, তত্ত্বের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, বাক্য ও মনের দ্বারা সেই স্বর্গীয় আলোককে দৃশ্য জগতের মর্ত্ত্যজীবের জন্য মূর্ত্তিমান্ করিয়া বেদে উপনিষদে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। যেদিন তাঁহারা বহুর পশ্চাতে এককে দেখিয়া, পৃথিবীর সকল দুঃখ বিপদ, রোগ-শোক-তাপ, পরীক্ষা প্রলোভনের মধ্যে তাঁহাকেই একমাত্র স্মরণীয় ও বরণীয় জানিয়া মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছিলেন; আনন্দকে অক্ষয় অটুটরূপে সর্ব্বত্র স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি"—আনন্দেই নিখিল চরাচরের উৎপত্তি, আনন্দেই জাত পদার্থসমূহের জীবন ও স্থিতি, এবং পরিণামে আনন্দেই সকলের পরিণতি ও বিলয়; যেদিন তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "তাঁহারই ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, ভয়ে তাঁহার সূর্য্য আলো দেয়, ভয়ে ইন্দ্র, চন্দ্র, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয়, —(ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি, ভয়াত্তপতিসূর্য্যঃ,)—এবং আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে আর কোথাও ভয়ের স্থান থাকে না" (আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন)—সেদিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য, সেই অভয় বাণী শুনাইবার জন্য, অনন্ত ভূমার সহিত, অসীমের সহিত, ক্ষুদ্র সসীম আমাদের জীবনকে মিলাইবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম নব্যভারতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং আমরা প্রতি বৎসর ব্রহ্মোৎসবের আয়োজন করিতেছি।

ব্রহ্মবিদ্যা স্বর্গের ধন ছিল। মর্ত্ত্যজীবকে তরাইবার জন্য কী আশ্চর্য্য কৌশলে পরম করুণাময় পরমেশ্বর ইহার ধারা এই জগতে, এই ভারতের জনসমাজে প্রবাহিত করিলেন, ভাবিলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইতে হয়। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, সগর রাজার সুযোগ্য বংশধর ভগীরথ তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষদের পরিত্রাণের জন্য স্বর্গের মন্দাকিনীকে ধরায় অবতীর্ণ করিয়া গঙ্গানদীর নির্ম্মলস্রোতে গ্রামজনপদের উর্ব্বরতাসাধনে সহায়তা করিয়াছিলেন। পুরাণের এই বর্ণনার সহিত এদেশে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া যায়। ভগীরথ বহু সহস্র বৎসরের তপস্যার ফলে যখন দেবপ্রসাদ লাভ করিয়া গঙ্গাকে স্বর্গধাম হইতে পৃথিবীতে আনয়ন করিলেন, তখন হইতে পদে পদে কত বাধা বিঘ্ন, কত সংগ্রাম, কত পরীক্ষা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল, এবং এসকল বিপদে ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাঁহাকে কত সাধনা করিতে হইয়াছিল—তাহা আমরা জানি। প্রথমে যোগীরাজ সন্ন্যাসী শঙ্কর এই স্বর্গের পবিত্র ধারাকে আপনার জটাজুটের মধ্যে ধারণ করিয়া, আপনার নিভৃত নির্জ্জন তপোবনে একান্তচিত্তে সম্ভোগ করিবার জন্য ইহাকে গোপন করিয়া রাখিলেন। অনেক তপস্যার পরে ভগীরথ সেই কঠোর সন্ন্যাসীর জটা হইতে গঙ্গার স্রোতকে নিঃসারিত করিলেন, কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইতেই আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। দারুণ পিপাসায় কাতর হইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জহ্নুমুনি গণ্ডূষে এই ক্ষীণ স্রোতস্বতীকে পান করিলেন ও তাঁহার বিশাল উদরে এই বহু

তপস্যার প্রভাবে স্বর্গ হইতে আনীত অনন্ত অক্ষয় সম্পদটি লৌহ-সিন্দুকে হীরামুক্তার মত আবদ্ধ হইয়া দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অগোচরে অব্যবহারে পড়িয়া রহিল। এই ব্রাহ্মণের উদর-গহ্বর হইতেও ভগীরথ কঠোর সাধনা ও অবিশ্রাম চেষ্টা করিয়া গঙ্গাকে মুক্ত করিলেন। তার পরে যখন গঙ্গার প্রবল স্রোত পাহাড়ের গায়ে বড় বড় পাথর জঙ্গল ভেদ করিয়া সমতলের দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তখন ঐরাবত হস্তী আপনার বিরাট দেহ ও বিপুল শক্তির গর্ব্বে মত্ত হইয়া, গঙ্গার সুন্দর অথচ তেজোময় রূপে অন্ধ হইয়া, তাঁহাকে আপনার বশীভূত করিতে ও জগতের কাজে না লাগাইয়া কেবল নিজের সম্ভোগের বস্তু করিয়া রাখিতে বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু মহাত্মা ভগীরথের পুণ্যে গঙ্গার স্রোত তখন স্ফীত হইয়া বিশাল আয়তন লাভ করিয়া এত বলবতী হইয়াছিল যে ঐরাবত হস্তী সামান্য তৃণের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে ভাসিয়া গেল। এইরূপে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জনপদে, সমতল প্রদেশে গঙ্গা প্রবাহিত হওয়ার ফলে কত জমি উর্ব্বরা হইয়াছে, কত আবর্জ্জনা ধৌত হইয়াছে, কত পিপাসু পথযাত্রীর প্রাণ শীতল হইয়াছে, কত ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির পথ সুগম হইয়াছে ও ভারতের প্রজাসাধারণ কত সম্পদশালী হইয়াছে! পৌরাণিক আখ্যায়িকায় রূপকচ্ছলে ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি, বিস্তার, বিকাশ ও পরিণতির কাহিনী প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে কিনা কে বলিতে পারে? ঋষিরা অনেক তপস্যা ও সাধনার দ্বারা যে অমূল্য দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন, তাহা ব্রহ্মবিদ্যা নামে

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা মানবাত্মার পরিত্রাণের জন্যই স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে প্রেরিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল ; কিন্তু মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এই অমরত্বের সন্ধান, এই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা গুপ্তধনের মত প্রচ্ছন্ন থাকায় সংসারের কোন কাজে, মানবসমাজের কোন কল্যাণে নিয়োজিত হয় নাই। প্রথমতঃ একশ্রেণীর সাধক—সন্ন্যাসী শঙ্করের প্রতিনিধি বা অনুচরগণ—গৃহপরিবার, সংসার ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়া গিরিগুহায়, অরণ্যে, নির্জ্জনে নিভৃতে এই ব্রহ্মবিদ্যার সাধন করিতে চাহিলেন। তাঁহাদের মতে এই ব্রহ্মজ্ঞানের মন্দাকিনী হিমালয়ের শৃঙ্গে তুষারাবৃত, সৌর কিরণে উদ্ভাসিত গুহাতে নির্ম্মল ঝরণার ধারার মত সঞ্চিত, গুপ্ত ও আবদ্ধ থাকার যোগ্য ; কারণ নিম্নভূমিতে অবতীর্ণ হইলে ইহা আবিল, পঙ্কিল, মলিন হইয়া ইহার স্বাভাবিক পুরাতন স্বচ্ছতা, শুভ্রতা ও বিমলতা হারাইবে। ব্রহ্মবিদ্যাকে এই যোগী সন্ন্যাসীদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া যখন সমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্ম্মীদের আয়ত্ত করার চেষ্টা হইয়াছিল, তখন জহ্নু মুনির বংশধর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা টিকি নাড়িয়া পৈতায় হাত দিয়া শাস্ত্রের বচন আওড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "আরে সর্ব্বনাশ ! কর কি তোমরা ? এমন উন্নত রহস্যময় দুর্ব্বোধ্য ব্রহ্মজ্ঞান সাধারণ মানুষের কাছে ছাড়িয়া দিলে কি আর রক্ষা আছে ? ইহাতে বানরের গলায় মুক্তার হার পরাইয়া এমন দুর্লভ সম্পদের অবমাননা করা হইবে ; আর সমাজে সাম্য ও একাত্মবাদের আদর্শ

প্রচারিত হইলে আমাদের পুরোহিত শ্রেণীকে কেহ মান্য করিবেনা; স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।" সুতরাং তাঁহারা সাংসারিক স্বার্থ ও ধন মানের পিপাসায় পৌরোহিত্যের প্রভাব রক্ষার অন্ধ লালসায় এক পণ্ডে এই ব্রহ্মবিদ্যাকে উদরসাৎ করিয়া নিজেদের যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড দানদক্ষিণা ও শ্রাদ্ধের ভোজনাদি সমাজে অব্যাহত রাখিলেন। কেবল বিশেষ জাতি, বিশেষ শ্রেণী ও বিশেষ অধিকারীর মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা আবদ্ধ থাকাতে কালক্রমে বেদ উপনিষদের অমর বাণী এদেশে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত এবং সমাজের নীতিধর্ম্মে ও আচরণে ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাব একেবারে লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা হইল। এই পৌরোহিত্যের অধিকারলোলুপ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হাত হইতে আবার বিধাতার মঙ্গলনিয়মে ব্রহ্মজ্ঞানের জ্যোতিঃ অন্য জাতি সকলে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু সমাজের মধ্যে যাহারা ধনে মানে ক্ষমতায় সর্ব্বসাধারণের বহু উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত, যাহারা পার্থিব সম্পদে ও পাশবিক বলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণিত, তাহারা অনায়াসে নিজেদের গৌরব ও অধিকার বিস্তার ও বৃদ্ধির জন্য গুপ্তধনের সন্ধান করিতে পারিতেন, এবং পরাবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে অপরাবিদ্যাকে আয়ত্ত করিয়া আপনাদের বিষয়তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য, ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য ও শক্তি পরিচালনার জন্য এই দৈবী সম্পদকে নিয়োজিত করিবার সুযোগ পাইতেন। পুরাণে রাবণ যেমন দেবতার বরে অমর হইয়া স্বর্গের দেবতার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ও ধর্ম্ম ও

নীতিকে পদদলিত করিয়া নির্দ্দোষ নর-বানরের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করিয়াছিল, এদেশে ও বিদেশে সেরূপ অনেক দুর্দ্দান্ত নৃপতি বা সেনাপতি বলসেবক নীতির আশ্রয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের অপব্যবহার করিয়াছেন। পুরাণের ঐরাবত হস্তীর পক্ষে গঙ্গার স্রোত রোধ করার চেষ্টার সহিত এসকল পার্থিব শক্তিশালী ব্যক্তিদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যাসাধনের তুলনা হইতে পারে। মহাত্মা রাজা রামমোহন ভগীরথের মত ব্রহ্মকৃপার মন্দাকিনীকে ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবাহিত করিতে গিয়া এই তিন শ্রেণীর সাধকরূপী প্রতিকূলশক্তিকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। যে উচ্চ আদর্শ হিমালয়ের পুণ্যতীর্থে সন্ন্যাসীদের সাধনের ধন ছিল, তাহাকে তিনি গৃহে, সমাজে, পরিবারে, সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যে ব্রহ্মবিদ্যা কৃপণের গুপ্তধনের মত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উদরে বা সিন্ধুকে চাবিবন্ধ হইয়াছিল, তিনি তাহা সকল জাতি, সকল শ্রেণীর মধ্যে মুক্তভাবে বিতরণ করিলেন। যে দিব্যজ্ঞান অল্পসংখ্যক অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষের হাতে ন্যস্ত হইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসাধন ও ক্ষমতা পরিচালনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাহাকে তিনি নীতিধর্ম্মে উন্নত, পবিত্রচরিত্র মানবমাত্রেরই পক্ষে গভীর সাধনা, কঠোর তপস্যা, ধ্যান আরাধনা ও প্রার্থনার দ্বারা দেবপ্রসাদে লভনীয় বলিয়া সর্ব্বসাধারণের কাছে প্রচার করিলেন, ও সমাজের উন্নতির জন্য, সাংসারিক ও পারিবারিক কল্যাণের জন্য ও জগতের দুঃখতাপ পাপ ব্যাধি দূর করার জন্য এই আধ্যাত্মিক সম্পত্তিকে একমাত্র

অব্যর্থ উপায় ও সঞ্জীবনী মহৌষধ বলিয়া মানবজাতির নিকট ঘোষণা করিলেন। এই ব্রহ্মর্ষিদের আবিষ্কৃত পুরাতন ভারতের গুপ্তধনকে রাজা রামমোহন পুনরাবিষ্কৃত করিয়া, পুনঃপ্রচলিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বর্ত্তমানযুগে সভ্যজাতিসমূহের—বিশেষতঃ ভারতীয় ও বঙ্গীয় জনসমাজের নিকট অসীম অপরিমিত শ্রদ্ধা, সম্মান ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ কি? ব্রাহ্মসমাজের নরনারী বিশেষভাবে এই ব্রহ্মবিদ্যার ও অধ্যাত্ম সাধনের উত্তরাধিকারী হইয়া, 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মের, সত্যশিব সুন্দরের রূপ ধ্যানে অভ্যস্ত হইয়া, এই মুক্তিপ্রদ ধর্ম্মের অমৃত রস আস্বাদনে নবজীবনের স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া, আনন্দে "জয় ব্রহ্ম জয়" গান করিতেছেন ও সকলকে এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের শীতল ছায়ায় আসিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন—ইহাই মাঘোৎসবের পুণ্যতীর্থে সকলের চেয়ে সুন্দর দৃশ্য এবং এখানেই ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা। উৎসবের প্রারম্ভে আমরা গাহিয়াছিলাম, "এসেছে ব্রহ্মনামের তরণী কে যাবিরে তোরা আয়রে আয় ....ধনী কি নির্ধন, জ্ঞানী কি অজ্ঞান, নাহি দেখে কারো জাতিকুলমান, ভবনদী পারে সেই যেতে পারে, ব্যাকুল অন্তরে যেতে যে চায়"। আজ উৎসবের শেষদিনে আমাদের সাক্ষ্য দিতে হবে—সত্যসত্যই কি আমরা ব্রহ্মনামের তরণীতে আরোহণ করিয়া ভবনদীর ওপারে জ্যোতির্ম্ময় অক্ষয় আনন্দধামের যাত্রী হইয়াছি? সত্যসত্যই কি আমাদের জাতিকুলের অভিমান ঘুচিয়া গিয়াছে? সত্যসত্যই কি আমরা পাপীতাপী হইয়াও ব্রহ্মকৃপায় মুক্তিলাভের আহ্বান

শুনিয়াছি ? সত্যসত্যই কি আমরা মধুর সঙ্গীতে ভুবন প্লাবিত, আনন্দলহরীতে দিক্ দিগন্তর তরঙ্গিত অনুভব করিতেছি সত্যসত্যই কি আমরা সর্ব্বভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সর্ব্বভূতকে দেখিয়া ধন্য হইয়াছি ? আজ অতীত ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া বর্ত্তমানে—এই জীবন্ত জাগ্রত বর্ত্তমানে—ব্রহ্মানুভূতির সাক্ষ্য দিতে হইবে। এই মুহূর্ত্তে এই মন্দিরে—"স্থানেতে এখানে সময়ে এখন"—আমাদের দেহ-প্রাণ-মন পূর্ণ করিয়া, অন্তর বাহির পরিব্যাপ্ত করিয়া, আমাদের নিঃশ্বাসে শোণিতাধারে, অস্থিমজ্জায়, চিন্তায় কল্পনায়, বুদ্ধিতে স্মৃতিতে, চৈতন্যময় আত্মাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সেই এক অসীম দেবাদিদেব আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন, ইহা কেবল কবির কবিত্ব নয়, রূপক নয়—দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রাণে প্রাণে গভীররূপে উপলব্ধি করিয়া, এই সাক্ষ্য দিতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগের দর্শন বিজ্ঞান কি এই সত্যটাকেই নানাভা নানা ভাষায়, বিভিন্ন আকারে, মূর্ত্তি দিবার, স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতররূপে ধারণার বস্তু করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে না ? গ্রীক দর্শনের আদি গুরুরা বহুর পশ্চাতে একেরই সন্ধান করিয়াছিলেন, মায়া ও ছায়ার (appearance) দৃশ্যজগৎকে সত্যবস্তুর প্রকাশরূপে ধরিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহ জলকে, কেহ অগ্নিকে, কেহ বায়ুকে মূলসত্তা, আদি কারণ, সর্ব্বব্যাপী পরমাধার ও একমাত্র জগতের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু জড়শক্তি ও ইন্দ্রিয় জগতের উপরে আত্মার

অস্তিত্ব ও অতীন্দ্রিয় জগতের আধিপত্য মানবেতিহাসে সর্ব্বপ্রথমে ভারতের ঋষিরাই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই আত্মার জগতের আবিষ্কারও ব্রহ্মবিদ্যার প্রবর্ত্তনের মত আমাদের দেশের একটি গৌরবের সামগ্রী। আত্মা কি, ইহার ধর্ম্ম কি, স্বভাব কি, জগতের সহিত ও দেহের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ, পরমাত্মার মধ্যে আত্মার ও আত্মার মধ্যে পরমাত্মার প্রকাশ কিরূপে উপলব্ধি করিতে হয়, আত্মজ্ঞানের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা কি, এসকল তত্ত্বের আলোচনা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে—উপনিষদ ও গীতায় গভীরভাবে ও বিশদ্‌ভাবে করা হইয়াছে। ঋষিরা নির্ম্মল হৃদয়ের দর্পণে আত্মার ছবি পরিস্ফুট দেখিয়া নশ্বর দেহকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন বা শারীরিক মৃত্যুকেই জীবনের শেষ পরিণতি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে শরীর আগুনে পুড়িয়া ছাই হয়, বাতাসে ধূলিকণা উড়িয়া যায়, ধূলিতে মিশাইয়া যায়, দেহের জলীয় উপাদান. জলেই বিলীন হয় ; দেহকে অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন করা যায়, শীতের দ্বারা সঙ্কুচিত ও তাপের দ্বারা প্রসারিত করা যায়। যাহা কিছু ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, দেখা যায়, চাখা যায়, শুঁকা যায়, তাহার সমবায়ে যে জীবন তাহার বিনাশ আছে, বিকার আছে, ক্ষয় আছে, পরিবর্ত্তন আছে ; কিন্তু মানুষ কেবল শরীর নয়, জীবন কেবল আহার নিদ্রা ও সম্ভোগের ব্যাপার নয়, কেবল অন্নের দ্বারা, নিশ্বাস বায়ুর দ্বারাই মানুষ বাঁচে না। পশু পক্ষী উদ্ভিদের চেয়ে মানুষের বিশেষত্ব এখানেই যে, তাহার আত্মা আছে, যাহা মৃত্যুর অতীত,

অবিনাশী, নির্ব্বিকার, হ্রাসবৃদ্ধি যাহাকে স্পর্শ করে না, অগ্নি যাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল যাহাকে সিক্ত করিতে পারে না, বায়ু যাহাকে শোষণ করিতে পারে না, শস্ত্র যাহাকে ছেদন করিতে পারে না, চক্ষু যাহাকে দেখিতে পায় না, কর্ণ যাহাকে শ্রবণ করিতে পারে না, কোন ইন্দ্রিয় যাহাকে অনুভব করিতে পারে না, বাক্য ও মন যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না—অথচ যাহা চক্ষুর দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ, বাক্য মনের কার্য্য সকলকে সম্ভব করিতেছে, যাহা আমাদের প্রাণের প্রাণ, মনের মন, মূলাধার, জীবনীশক্তি। এই আত্মাকে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত দেখিয়াই তাঁহারা বলিয়াছিলেন—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য, আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মননেন বিজ্ঞানেন সর্ব্বমিবং বিদিতং ভবতি।" মহর্ষি ঈশা যেরূপ বলিয়াছিলেন—"তোমরা আগে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, তা'হলে অন্য যা কিছু তোমাদের কাছে আপনা হ'তেই আসিবে", তেমনি ব্রহ্মর্ষিরা আমাদের দেশে আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন, বিজ্ঞান ও নিদিধ্যাসনকেই সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন এবং এই আত্মার রাজ্যে প্রবেশ করিলেই আর সব পার্থিব ও স্বর্গীয় ধনের অধিকারী হওয়া যায় এরূপ আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন। এই আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মবিদ্যাকে তাঁহারা পৃথক করিয়া দেখেন নাই। একই সত্যের বিভিন্ন বিচিত্র প্রকাশরূপে তাঁহারা ব্রহ্মের ও আত্মার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এজন্যই তাঁহারা বলিয়াছেন—"আত্মাকেই প্রিয় জানিয়া উপাসনা করিবে; পুত্রের

জন্য পুত্র প্রিয় নয়, আত্মার জন্যই পুত্র প্রিয় হইয়া থাকে ; বিত্তের জন্য বিত্তকে প্রিয় মনে করিওনা, আত্মলাভের কামনায়ই বিত্ত কামনা করিও।" কারণ এই "আত্মা পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল বস্তু হইতে প্রিয়।" তাঁহারা আত্মার রাজ্যে শাশ্বত শান্তি ও আনন্দের সন্ধান পাইয়া বলিয়াছেন, "এষাস্য পরমা সম্পদ্, এষাস্য পরমাগতি, এষোঽস্য পরমোলোকঃ এষোঽস্য পরম আনন্দঃ"।—এই আনন্দের মধ্যেই জগতের জন্ম, স্থিতি ও পরিণতি, এই আনন্দের সাগরের এক একটি তরঙ্গই প্রাণীজগতে প্রাণরূপে উঠিতেছে, ভাসিতেছে, ও দুদিন পরে মহাপ্রাণের আনন্দ সাগরে ডুবিতেছে ও মিশিতেছে। কে বাঁচিত, কে শরীর-চেষ্টা করিত যদি আনন্দরূপে আত্মা সকল আকাশ পরিব্যাপ্ত না করিতেন? এই আনন্দের এক কণা পাইয়া চন্দ্র সূর্য্য নৃত্য করিতে করিতে শূন্যপথে ধাবিত হয় ; এই আনন্দের এক স্ফুলিঙ্গ অগ্নি ও বিদ্যুৎকে দীপ্তি দিতেছে ; এই আনন্দের একটু রস পাইয়া পাখীর সুললিত গান, বৃক্ষের সুরসাল ফল, সুবাসিত ফুলের সুগন্ধ এত সুমধুর হইয়াছে। এই আনন্দে ডুবিয়া কত ঋষিযোগী বিষয়ে বিরাগী হইয়া যোগাসনে অটল থাকিতেছেন, এই আনন্দরসের আস্বাদনে একবার বিভোর হইলে, সকল বিবাদ দূর হয়, অন্য কোন সাধ থাকে না। "তরতি শোকং তরতি পাপং"—সেই মোদনীয় পরম আত্মাকে পাইয়া। রসস্বরূপের সাক্ষাৎ সম্ভোগ যাহার ভাগ্যে লাভ হয় তিনি সকল সন্দেহ, সকল মায়াবন্ধনের অতীত হইয়া যান,—"ভিদ্যতে

হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ"। প্রাচীন ঋষিরা যে দেবতাকে সর্ব্বভূতে প্রাণরূপে, শক্তিরূপে, আত্মারূপে বিরাজিত দেখিতেন (যা দেবী সর্ব্বভূতেষু প্রাণরূপেন সংস্থিতা—ইত্যাদি), যে দেবতাকে অগ্নিতে, জলেতে, ওষধিতে বনস্পতিতে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান দেখিতেন, তাঁহাকেই বর্ত্তমান বিজ্ঞান সর্ব্বভূতের অন্তরালে—জড়-জীব-নরের পশ্চাতে প্রাণরূপী চৈতন্যরূপী মহাশক্তি বলিয়া স্বীকার করিতেছে। ভারতেরই বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র আপনার অক্লান্ত গবেষণা দ্বারা প্রাচীন ঋষিদের আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ, জীবনের পরীক্ষিত সত্যকে বর্ত্তমানকালের নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সাধনাকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। আত্মাকে আর আমরা জড় অচেতন প্রাণহীন পদার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দেখিতে পারি না—কারণ স্বপ্রকাশ আত্মা আপনার জ্যোতিতে আপনি আলোকিত, আপনার মহিমাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জড় চেতনের, প্রাণী ও অপ্রাণীর ব্যবধানের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিতেছেন। আজ বিজ্ঞান দর্শন এক মন্ত্রে, এক তন্ত্রে, দীক্ষিত হইয়া এক কণ্ঠে, এক তানে সুর মিলাইয়া একেরই মহিমাগীতি গান করিতেছে, ও আত্মাকে সকল আকাশে, সকল কালে, সকল বস্তুতে, সকল ব্যক্তিতে, অখণ্ড সত্তারূপে, পরিপূর্ণ জ্ঞানরূপে, অনাবিল পবিত্রতারূপে, নিরাময় আনন্দরূপে, নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্যরূপে প্রকাশিত দেখিয়া ভূমার—অসীমের—পূজার প্রাধান্য স্বীকার করিতেছে। এই অনন্তের উপাসনাকে

ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান বিজ্ঞান দর্শনের অভিনব আবিষ্কার ও চিন্তার সহিত মিলাইয়া জনসাধারণের কাছে অতি সরল সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্মসাধনের ভিতর দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাচীন ঋষিদের সহিতই সুর মিলাইয়া বলিতেছেন, "নায়মাত্মা প্রবচনেনলভ্যঃ ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন,"—এই আত্মা কেবল বহুশাস্ত্র পাঠ করিলেই লাভ করা যায় না, তর্ক বিতর্কের দ্বারা নয়, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে নয়। যাহারা দুশ্চরিত্র হইতে বিরত হয় নাই, যাহারা অশান্ত, অসমাহিত, যাহারা বলহীন, তাহারা কেবল জ্ঞানের দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। কিন্তু আত্মপ্রভাবের সঙ্গে দেবপ্রসাদের মণিকাঞ্চন যোগে ও জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধসত্ত্ব হইলে সেই আত্মা সাধককে বরণ করেন। সোজা কথায়, "যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাতি বিচার।" এখানে পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ শূদ্র, এমন কি সাধু পাপীরও ভেদাভেদ নাই। কেবল পবিত্র হৃদয়ে ব্যাকুল অন্তরে বিনীত চিত্তে ভক্তিভরে আত্মসমর্পণ করিলেই যে কোন ব্যক্তি দেবাদিদেবের মন্দিরের পূজারীরূপে গৃহীত হইবেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনটী—সর্ব্বভূতে আত্মাকে উপলব্ধি করা—অতি সুন্দররূপে সকলের নিকট বোধগম্য করিবার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের দুইটি সঙ্গীত আমার কাছে অতিশয় উপযোগী, উপাদেয় ও সহায়তাকারী মনে হয়। এই দুটি সঙ্গীতের ভাব মাঘোৎসবের নৈবেদ্যরূপে উপস্থিত করিয়া আমার বিনীত নিবেদন শেষ করিব। একটি গানের প্রথম দুই লাইন এই—

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার,
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

সামাজিক সাধন ও সম্মিলিত উপাসনা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি বিশেষত্ব। সকলকে নিয়া সকলের সঙ্গে দেবাদিদেবের সহিত যুক্ত হইতে হইবে। "নয়ক বনে, নয় বিজনে, নয়ক আমার আপন মনে, সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, আপন সেথায় আমারো।" সকলের সঙ্গে যেখানে বিশ্বনাথের যোগ সেখানেই আমার সঙ্গেও যোগ। তিনি আমার একলার গোপন ধন নহেন, আমি তাঁহাকে সর্ব্বাধার, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বভূতের আত্মারূপেই দেখিতে চাই, পাইতে চাই। সকলের পানে যেখানে তিনি প্রেমহস্ত প্রসারিত করেন, সেখানেই আমার সঙ্গে তাঁহার মিলন। মর্ম্মী কবি ও ঐকান্তিক ভক্তেরা যেমন সঙ্গোপনে হৃদয়ের নিভৃত প্রকোষ্ঠে প্রাণপতির প্রেম ভোগ করিতে চান, বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মসাধক—ব্রাহ্ম ভক্ত—সে পথ ছাড়িয়া সজনমার্গের পথিক হইয়া বলেন—"গোপনে প্রেম রয়না ঘরে, আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে, সবার তুমি আনন্দ ধন, হে প্রিয়, আনন্দ সেই আমারো।" বৃন্দাবনের রাস-লীলায় গোপীদের মত কেবল আপনার পাশেই হৃদয়েশ্বর প্রাণপতিকে দেখা নয়, সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেই বিশ্বপতিকে সকলের সহিত অনন্ত প্রেমে যুক্ত দেখাই এ যুগের সাধন। আমি যদি আপনার প্রাণে আনন্দরসধারা পাই, অমৃতস্পর্শ লাভ করি ও একাকীই আনন্দময়কে সম্ভোগ করিবার জন্য আপনার হৃদয়মন্দিরে তাঁহাকে আবদ্ধ রাখিতে চাই, তাহলে

পরিপূর্ণ আনন্দ পাইব না, সত্যভাবে প্রেমময়ের প্রেমলীলা দেখিতে পাইব না। সকলের হৃদয়ে হৃদয়ে সেই আনন্দ-লহরী যখন তরঙ্গিত হয়, সেই রসমধুধারা সকল "ভগবত প্রেম-পিয়াসীর" প্রাণে উচ্ছ্বসিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, ও আনন্দের বন্যায় এ লোক সে লোক, আকাশ পাতাল, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভাসিয়া যায়, বিশ্বজগতের সকল দেশের, সকল যুগের, সকল ধর্ম্মের, সকল সম্প্রদায়ের সাধু ভক্ত নরনারী ও পাপী তাপী মূর্খ চণ্ডাল সকলে ভাসিয়া যা . তখনি প্রেমের উৎসব সম্পূর্ণতা ও সার্থকতালাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি গানে আরও স্পষ্ট ভাষায় এই প্রেমের উৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায়।—

"জ ৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে।
বা ' জল, আকাশ আলো, সবারে কবে বাসিব ভাল,
হৃদ ভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে।
ন. . টি মেলিলে কবে পরাণ হবে খুসি,
যে দয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি।
রা ~ ম একথা কবে জীবনমাঝে সহজ হবে,
অ কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সব কাজে।"

বিশ্বভু র সর্ব্বত্র পরমাত্মার অনাদি রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে, স ত্র উদার সুরে আনন্দ গান বাজিতেছে, কেবল মানবাত্মা পনার স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার ফলে সে

রাগিণী হইতে বঞ্চিত। বেসুরা হইয়া আমরা এই বিশ্বসঙ্গীতের তান মান হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছি ও নানা কোলাহলের সৃজন করিতেছি। কিন্তু অন্তরের মাঝে যখন সেই আনন্দ গান গভীর রবে বাজিয়া উঠে, তখন হৃদয়ের সকল তন্ত্রী সমস্বরে ঝঙ্কৃত হয়, জীবনের সকল রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই তান সমীরিত হয়, তখন সকল বস্তুর ও সকল ব্যক্তির সহিত আমাদের এক আশ্চর্য্য মিলন ও সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, সর্ব্বত্র শান্তি ও সুশৃঙ্খলা বিরাজ করে, প্রকৃতি ও মানবসমাজের মধ্যে কোন ব্যবধান, বৈষম্য বা অমিল থাকে না,—তখন আকাশ বাতাস, জল আলোক, সকলেই আমাদের অতি আপনার হইয়া যায়—তারা আমাদের ভালবাসে ও আমরা তাদের ভালবাসি। ইহাই যথার্থ সর্ব্বভূতে আত্মার প্রকাশ ও আত্মাতে সর্ব্বভূতের প্রকাশ। বিজ্ঞানের চিন্তাতে যে জড়কে প্রাণময় বলিয়া দেখা, তাহাও নিম্নতর দৃষ্টি; কিন্তু প্রেমের চক্ষে যখন সেই জড়জগৎ আপনার জন হইয়া যায়, যখন বাতাস জল, আকাশ আলো—সবারে ভাল বাসিতে পারি, তখনই সত্য দেখা, উচ্চতর দর্শন হয়। এমন মানুষ পৃথিবীতে জন্মেন—কবি ঋষি ভক্তদের মধ্যে এমন প্রেমিক এখনও দেখা যায়, যাঁহারা সত্য সত্যই সর্ব্বভূতে চৈতন্যের বিস্তার ও প্রেমের প্রসার করেন—ইহা জগতের পরম সৌভাগ্য। ব্রাহ্মসমাজে এমন ধর্ম্মবন্ধু ও ধর্ম্মগুরু পাইয়াছি, যাঁহারা প্রেমময়ের আশীর্ব্বাদে এমন প্রেমের দৃষ্টি নিজেরা লাভ করিয়া অন্যের চক্ষেও নূতন দিব্য দৃষ্টির আলোক ফুটাইয়া দেন; ইহাতে আমরা নিজকে ধন্য মনে

করি। ধর্ম্মত মানুষকে প্রিয় করেই, মানুষের সঙ্গে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সদ্ভাব জন্মায়ই; কিন্তু আমরা এতদিন যাহাদের অচেতন প্রাণহীন জড় বস্তু মনে করিয়া দূরে রাখিতাম, যে প্রকৃতিতে অন্ধশক্তিপুঞ্জের সমাবেশমাত্র দেখিয়া আমাদের ধর্ম্মসাধনের অন্তরায় মনে করিতাম, যে রূপ-রস-গন্ধ আমাদের মোহপাশে বদ্ধ করে ও অদৃশ্য লোকের প্রতি আমাদের অন্ধ করিয়া রাখে বলিয়া এতদিন রিপুর মত গণ্য হইত, আজ তারা সকলেই আমাদের পরমাত্মীয়, পরম প্রিয়জন, হইয়া আমাদের অন্তরের রাগিণীর সহিত সুর মিলাইয়া বিশ্বজগতের আনন্দগানের সহিত যোগ দেয় ও আমাদিগকে সেই পরম দেবতার চরণে লইয়া যাইবার সহায়তা করে। ইহাই ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র বাণীর বিশেষত্ব। এই উপলব্ধিটিই আমাদের মাঘোৎসবের বিশেষ সাধন ও নববর্ষের নবব্রত হউক।

"ডাক আজ সখারে মধুর স্বরে।"

১৬ই জানুয়ারী, ১৯২২।

আজই তাঁহাকে ডাকিবার সময়, আজই তাঁহার নাম স্মরণ করিবার দিন। এই স্থানে এই মুহূর্ত্তে হৃদয়-সখাকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লও। এই শুভ দিনে, এই স্বর্ণসুযোগে, এই পবিত্র উৎসবের দ্বারে, এই সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে যদি তাঁহাকে অনুভব না করিলাম, তবে আর কখন করিব? তিনি করুণা করিয়া আজ

আপনি আসিয়া দীনজনের কুটীরে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার এই স্নেহের মধুর রব শুনিয়া সমুদয় বিশ্বজগৎ আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে, প্রকৃতি নূতন সাজে ভূষিত হইয়াছে, ফুলফল, শস্যতৃণ, বৃক্ষলতা নূতন শোভা বিস্তার করিতেছে, আকাশে নূতন আলোক নূতন হাওয়ার ঢেউ খেলিতেছে, পাখীরা নূতন সুরে নূতন গান গাহিয়া নূতন আনন্দে নৃত্য করিতেছে। এই নূতন উৎসবে যদি আমি পুরাতন জীবন পরিত্যাগ করিয়া নব বসন পরিতে না পারি, তবে আর কখন পারিব? আজ সকল জীব, সকল জড়, সকল প্রকৃতি, সকল আত্মার সহিত হৃদয় মিলাইয়া মধুরস্বরে সখাকে ডাকি। তাঁহার প্রেমে আজ সকল ভুলিয়া তাঁহার মধ্যে নিজেকে পাই।

সুন্দর দেবতার আবির্ভাব।

৫ই মাঘ। ১৮ই জানুয়ারী, ১৯২৯।

হে সুন্দর দেবতা, তুমি আমার অন্তরে সৌন্দর্য্যের ছাপ রাখিয়াছ, তাই বাহিরে প্রকৃতি ও মানবাত্মার যেখানে যাহা সুন্দর তাহাই আমার অন্তর স্পর্শ করিয়া তরঙ্গায়িত করে। যখন কোন সুন্দর বস্তুর সম্মুখীন হই, তখন তোমার মুখ-ছবি আমার অন্তরে জাগ্রত হয়। যখন যেখানে সুন্দর কিছু আমার নিকটে আসে তখন তোমার প্রেম মুখের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। হে মধুর, হে প্রিয়, তোমার সৌন্দর্য্যের মধ্যে এ কী আকর্ষণ রহিয়াছে,

প্রাণকে উতলা করিয়া দেয়, কি যেন হারানো ধন আমার হাতে পাই, তোমার সৌন্দর্য্য স্পর্শ করিয়া, আলিঙ্গন করিয়া আমি তোমার সহিত মিলনের আনন্দ পাই। যেখানে সৌন্দর্য্য সেখানেই মাধুর্য্য, সেখানেই কোমলতা, সেখানেই প্রেম, সেখানেই আনন্দ। মানুষের জীবনে তোমার প্রেমধারা যখন বর্ষিত হয় তখন তাহার দেহে মনে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। এই পবিত্র দৃশ্য দেখিলে হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠে, প্রাণে নূতন শক্তি আসে, নবজীবনের অনুপ্রাণনা আসে। তুমি ধন্য যে আমাদের জীবনে এমন অভিজ্ঞতা দেও। আমরা ধন্য যে তোমার সৌন্দর্য্য-সুধা আস্বাদন করিয়া আমাদের মর্ত্ত্য জীবনে নশ্বরদেহে স্বর্গের অমৃতের অভিজ্ঞতা পাই। তুমি আমাকে এই সৌন্দর্য্যরসে ডুবাইয়া রাখ, এই প্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া, আমরা আত্মহারা হইয়া তোমার চরণে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণিপাত করি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের শিক্ষা।

৬ই মাঘ। ১৯শে জানুয়ারী, ১৯২৯।

আজ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতি-উৎসবের দিন। প্রতিবর্ষে এই দিনে তাঁহার জীবনের পুণ্যস্রোতে কত নর নারী অবগাহন করিয়া আপনাদের হৃদয়মন পবিত্র করেন। মহর্ষির জীবনের প্রথম শিক্ষা ধ্যানপরায়ণতা—ধ্যানে মগ্ন হইয়া আত্মাতে পরমাত্মার

সান্নিধ্য ও শক্তিমত্তা অনুভব করা। দ্বিতীয় শিক্ষা, সংসারে গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে ধর্ম্ম সাধন করা, প্রার্থনা দ্বারা পূর্ণ হইয়া বিষয় রক্ষা, সম্পত্তি অর্জ্জন ও উপভোগ করা, পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ রূপে জগতের সকল সুখ দুঃখকে হাসিমুখে গ্রহণ করা ও পুত্রকন্যাদের শিক্ষা দীক্ষা, পরিবারের সকলের প্রতি কর্ত্তব্য-পালন ইত্যাদি বিষয়ে ভগবানের অভিপ্রায় ও বিধান বুঝিবার ও তদনুসারে চলিবার চেষ্টা। তৃতীয় শিক্ষা, কর্ম্ম ও সন্ন্যাস, ভোগ ও ত্যাগ, সংসার ও বৈরাগ্য, বিষয় ও ধর্ম্মসাধন—এই দ্বন্দের মধ্যে সমন্বয়। মানুষ যদি ঈশ্বরকে চায় তবে কেবল সকাল হইতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মের মধ্যে, ভোগের মধ্যে, সাংসারিক কর্ত্তব্যের মধ্যে, বিষয়-সম্ভোগের মধ্যে তাঁহার শুভাশীষ ও প্রেরণা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেনা, আরও নিবিড়ভাবে, আরও গভীরভাবে, একান্তে, নির্জ্জনে তাঁহাকে পাইবার, তাঁহার কোলে নিজের মাথা রাখিবার চেষ্টা করিবে। মহর্ষি এজন্য মাঝে মাঝে সমাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিতেন, লোকালয় হইতে দূরে গিয়া নির্জ্জনে নদীর উপর নৌকার ছাতে বসিয়া কিম্বা সমুদ্রের তীরে অথবা উচ্চ হিমালয় পর্ব্বতের গভীর অরণ্যে তাঁহার সামীপ্য ও সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার জন্য সাধন করিতেন। আমরা সংসারের পেছনে দাসত্ব করি, কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মনীতি ষোলআনা সম্পাদন বা অনুশীলন করিলেও আমরা তাহা হইতে নির্লিপ্ত না হইয়া জড়িত হইয়া পড়ি, এজন্য ধ্যান-ধারণার অভাবে উপাসনা শুষ্ক হয়, চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট হয়,

প্রাণে সরলতার পরিবর্ত্তে দুর্ব্বলতা আসে, হৃদয়ের স্বর্গীয় অনুপ্রাণনা বন্ধ হইয়া যায়। ধর্ম্মের জন্য মানুষকে মাঝে মাঝে বিরাগী সন্ন্যাসী হইতে হয়।

মহর্ষির জীবনের চতুর্থ শিক্ষা, আনন্দও প্রেমরূপী ভগবানের উপাসনা। তাঁহাকে আনন্দময় বলিয়া স্বীকার করিলে সকল শিল্পকলায়, আহারে, পোষাকে সৌন্দর্য্যের অনুশীলন করিতে ইচ্ছা হয়; সকল পারিবারিক উৎসবে, জাতকর্ম্মে, নামকরণে, অন্নপ্রাশনে, বিবাহে, জন্মদিনে ও শ্রাদ্ধবাসরে সেই পরম প্রভু জীবনেশকে নিয়া আনন্দ করিতে ইচ্ছা হয়; প্রেমের চক্ষে জগতকে দেখিয়া সকল মানুষকে প্রেমে আলিঙ্গন করিবার, সকল দুঃখীদরিদ্রকে প্রেমে আপনার করিবার, রোগী শোকীকে সাহায্য ও সান্ত্বনা দিবার, পশু পক্ষীকে পর্য্যন্ত প্রেমের ডোরে বাঁধিবার ইচ্ছা হয়। সমাজের হিতের জন্য অনাথাশ্রম, বিধবাশ্রম, আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠা, দুর্ভিক্ষে, জলপ্লাবনে, অগ্নিদাহে, মহামারীর প্রাদুর্ভাবে, অন্ন ও অর্থ সাহায্য প্রসারিত করা, শিক্ষা বিস্তার, ধর্ম্মপ্রচার ইত্যাদিতে শক্তি নিয়োগ, আত্মবিলোপ—এই প্রেমের দেবতার প্রিয়কার্য্যসাধন।

তোমার মিলন মন্দিরের পুণ্যতীর্থের দিকে জীবনের প্রবাহ।

১৫ই মাঘ। ২৮শে জানুয়ারী, ১৯২৯।

মাঘোৎসবের মধ্যে তোমার করুণা সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইলাম। এখন আশীর্ব্বাদ কর যেন চিরকাল তোমার এই আনন্দ, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য রস-ধারায় স্নাত হইতে পারি। তুমি প্রাণপতি, হৃদয় স্বামী, তোমারই প্রতিরূপ বিশ্বসংসারে প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য্যে, আকাশে বাতাসে, চন্দ্র সূর্য্যে, বিদ্যুতে অগ্নিতে, বৃক্ষে লতায়, পত্রে পুষ্পে, তৃণের শ্যামলতায়, অরণ্যের সবুজতায়। তোমারই প্রতিমূর্ত্তি সকল মানবের মুখে, বন্ধুর আলিঙ্গনে, প্রিয়জনের কোমল স্পর্শে, শিশুর মিষ্ট হাসিতে, স্ত্রীপুত্র ভাই ভগিনীর মধুর বাক্যে। তোমারই প্রেম সকল দুঃখে, সকল বেদনায়, সকল শোকে ও বিপদে আমাদের সান্ত্বনা দেয়। তুমি আমাদের অশ্রু মুছাইয়া দাও; কোলে তুলিয়া, মাথায় হাত বুলাইয়া আমাদের ক্ষত হৃদয়কে আরাম দাও; আমাদের পাপ প্রকৃতিকে দমিত করিয়া, দুরন্ত রিপু ও বাসনাকে, ইন্দ্রিয়ের ভোগ লালসাকে শান্ত ও সমাহিত করিয়া তুমি আমাদের হৃদয়কে শুদ্ধ কর, জীবনকে পবিত্র কর, অনুতাপের অশ্রুজলে সকল পাপের জ্বালা ধৌত কর, সকল কালিমা মলিনতা অপসারিত করিয়া পুণ্য বসন পরাইয়া দাও। তোমার শুভ্রক্রোড়ে মাথা রাখিয়া আমরা সকল ভয় ভাবনা হইতে, সকল উদ্বেগ অশান্তি

হইতে মুক্ত হই। শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া তোমার চরণে মাথা রাখিয়া শান্তি পাই। তুমি উৎসবান্তে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন, জীবনে আর শুষ্কতা ও অবসাদ না আসে, কেবল প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম ও সেবার ভিতর দিয়া অবিরাম জীবনের প্রবাহ তোমার মিলনমন্দিরের, প্রকাশমন্দিরের পুণ্যতীর্থের দিকে ছুটিতে থাকে।

এস হে গৃহদেবতা।

১৮ই মাঘ। ৩১শে জানুয়ারী, ১৯২৯।

গৃহ দেবতা তুমি, নূতন গৃহে তোমার আসন পাত। তোমার আশীর্ব্বাদ এই গৃহকে আলোকিত রাখুক, তোমার করুণার কণা এই গৃহের প্রতি অণুপরমাণুকে সমুজ্জ্বল করুক। তুমি এই গৃহের স্বাস্থ্য বিধান কর। তোমার স্বর্গের আলোক হাওয়া এর প্রতি কক্ষকে নির্ম্মল ও হাস্যময় করুক। তুমি করুণা করিয়া যে কয়দিন এই পৃথিবীতে বাস করিতে দেও, ততদিন যেন এই গৃহে প্রেম, পুণ্য, শান্তি ও আনন্দের প্রবাহ অক্ষুন্ন থাকে। এখানে বাস করিয়া আমরা সুস্থ হই, পবিত্র হই, উন্নত হই, কল্যানযুক্ত হই। আমাদের সকলকে তুমি শুভ মতি দাও, শুভচিন্তায়, শুভকর্ম্মে ও শুভবাক্যে নিয়োজিত রাখ। তোমার গৃহ, তোমার অন্নজল, তোমারি বস্ত্র আমাদের সর্ব্বদা রক্ষা করে, পুষ্ট করে। জীবনে যাহা কিছু সম্ভোগ করি, যাহা কিছু অর্জ্জন করি, যাহা কিছু পাই, যাহা কিছু চাই, তার মধ্যে তোমারি দান স্বীকার

করি, তোমারি কৃপা স্মরণ করি। ভক্তিভরে বার বার কৃতজ্ঞতার সহিত তোমার চরণে প্রণাম করি। এবারকার মাঘোৎসব আমাদের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল বিধান করুক, আমাদের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে সহায়তা করুক। আমার স্ত্রী, পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজন সকলকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন এই গৃহে তোমার প্রেম-পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের সকল নর নারী জগতের সকল সাধুভক্তের সহিত মিলিত হইয়া এখানে তোমার নামকীর্ত্তন করুন। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তোমার নাম ধন্য হউক।

তোমার সৌন্দর্য্যের আলোকে পার্থিব সৌন্দর্য্য ম্লান হয়।

২২শে জানুয়ারী, ১৯৩৩।

জগতের জননী তুমি, আমার নিকট কি তুমি মাতৃস্নেহ ঢাকিয়া রাখিবে? আমাকে কেন তোমার প্রেম সুধা হইতে বঞ্চিত রাখ? আমার প্রাণে কেন এত সংগ্রাম, এত পরীক্ষা, এত প্রলোভন? আমি কেন তোমার সন্তান হইয়া তোমার বিদ্রোহাচরণ করি, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন চলিতে যাই? তোমার কৃপায় আমার হৃদয় পবিত্র হউক, আমার প্রাণ প্রেমে ভরপূর হউক। তোমার সৌন্দর্য্যে আমার মন এত মুগ্ধ হউক যে সকল পার্থিব সৌন্দর্য্য তাহার কাছে ম্লান হইয়া

যায়। তোমার মাধুর্য্য আমার জীবনকে সরস করুক, মধুময় করুক, তোমার ইচ্ছার জয় হউক।

আত্মাদ্বারা আত্মাকে উদ্ধার কর।

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৩।

উৎসবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আত্মাকে জিজ্ঞাসা করি—জীবনের পথে চলিবে না মরণের পথে চলিবে? শ্রেয়ের পথে যাইবে না প্রেয়ের পথে যাইবে? তোমার উপাস্য যিনি, পরমাত্মা যিনি, তাঁহার অনুগত হইবে না বাসনার দাস, প্রবৃত্তির দাস, রিপু কুলের অধীন হইবে? আজ তোমার অন্তরাত্মা অনুসন্ধান করিয়া দেখ, মনের গোপনে কত হিংস্র সর্প, ব্যাঘ্র, কুকুর লুক্কায়িত আছে! তুমি চিরকাল যে সব কামনার সেবা করিয়াছ, তাহারা দুধ কলায় পুষ্ট হইয়া তোমার দেহমনের উপর কিরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে! দেখ তুমি কোন্ স্বর্গের উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে গভীর পাতালের নিম্নে নামিয়া গিয়াছ! তোমার আকাঙ্ক্ষা এখনও কি রূপের পশ্চাতে, সৌন্দর্য্যের পশ্চাতে, আপাতসুখকর রমনীয় পদার্থসমূহের পশ্চাতে ছুটিবে? এখনও কি তুমি অসত্যের দাস, অসার মলিনতার কীট হইয়া থাকিবে? পদে পদে শ্রেয়কে, আদর্শকে লাঞ্ছিত করিয়া ভীরু কাপুরুষের মত অসত্য, অন্যায়, অশুভের

সহিত আপোষ করিয়া চলিবে? উঠ, জাগ, অস্ত্রধারণ কর, দ্বেষ-হিংসা-পাপরূপী অসুর বিনাশে উদ্যত হও, আত্মাকে আত্মা দ্বারা উদ্ধার কর।

প্রেয়ের পশ্চাতে ছুটি শ্রেয়েরই সন্ধানে।

২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩৩।

এইত উৎসবের দেবতা, তুমি যে করুণা-নিধান, পাপীতাপীদের জন্য তোমার করুণার দ্বার খুলিয়া দিয়াছ। আমরা নয়নের জল সম্বল নিয়া তোমার করুণার স্রোতে ভবসাগর পারে যাইব। তুমি সত্য, স্বপ্রকাশ, অনন্ত, আমার সকল ক্ষুদ্রতাকে অভিভূত করিয়া তোমার মহান্ আদর্শ সম্মুখে প্রকাশিত করিয়াছ। পুণ্যের আলোকে আমার মোহের আঁধার দূর করিয়াছ। শুষ্ক প্রাণকে তোমার মধুর নামের স্পর্শে সরস করিয়া দিতেছ। তোমার অনির্ব্বচনীয় অরূপ সৌন্দর্য্য, তোমার অনুপম মাধুর্য্য আমাকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। মানুষের মুখশ্রীতে, সকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তোমারই মুখচ্ছবি প্রকাশিত হইয়া আমাকে পবিত্র করিতেছ। যত প্রেয়ের পশ্চাতে ছুটি তাহা তোমারই শ্রেয়ের সন্ধানে। তোমার অমৃতত্বের জন্য ধন আকাঙ্ক্ষা করি, মান আকাঙ্ক্ষা করি, পৃথিবীর সুখসম্পদ, সংসারের আরাম আমোদ আকাঙ্ক্ষা করি। যদি তোমার অমৃত রস এসকলের ভিতর দিয়া আস্বাদন না করি, তবে যে সবই বৃথা। যদি তোমাকে

ছাড়িয়া ধন জন মান চাই, তবে আমি ধন জন মান পাইলেও শান্তি পাইব না, আনন্দ পাইব না। তুমি কৃপা কর, প্রাণে প্রেমের সঞ্চার হউক, ভক্তিতে ডুবিয়া তোমার নব বৃন্দাবনে বাস করি।

দাস্তমুক্তি।

২৬শে জানুয়ারী, ১৯০৩।

আনন্দময় দেবতা, মুক্তির সমাচার তুমি নিয়া আসিয়াছ, এতদিনে আমাকে বন্ধন থেকে মুক্ত কর। সকল সীমার, নিয়মের, বাহিরের মোহ-মায়ার বন্ধন তুমি ছিন্ন করিয়া আমাকে স্বাধীন করিবে বলিয়া আজ আশার বাণী শুনাইতেছ। তোমার ছাড়পত্র আসিয়াছে, আমাকে বলিতেছ, এই বন্ধন ছাড়, হিংসা-দ্বেষ, মান অভিমান, লোকভয়, লজ্জা সরম, অপ্রেম এসকলের দাসত্ব ছাড়, এই দড়ি কাট, সংসারের, সমাজের, চাকুরীর বন্ধন খোল। তুমি যে আমাকে দাস্ত মুক্তি দিবে, তাহাই সকল স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ। তোমার অনুগত হইয়া চলিব, তোমার শ্রবন, মনন, কীর্ত্তন, পূজা, উপাসনা নিয়া থাকিব, তোমার নাম গুণ গান করিব, তোমার প্রসঙ্গ নিয়া থাকিব। তোমার প্রেমে নিজে মাতিব ও অন্যকে মাতাইব, ঘরে ঘরে হরিনাম বিলাইব, সত্য ধন, নিত্য ধন, সার ধন, তোমার পুণ্য:ধন, প্রেম ধন বিলাইব। এই মুক্তিতে তোমার আদেশই একমাত্র নিয়ম, একমাত্র বিধি, আনন্দের সহিত তোমার আদেশ পালন করিব। আহারে, বিহারে, কথায় কাজে,

চিন্তা-ভাবনায়, কল্পনায় স্মৃতিতে তোমা বৈ আর অন্য বস্তুর সহিত সম্পর্ক থাকিবে না, তোমার ধ্যান, তোমার জ্ঞান, তোমার প্রেমানন্দ রস পান আমার একমাত্র লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য সাধন হইবে। তুমিময় বিশ্ব ও বিশ্ব তুমিময় দর্শন করিয়া, তোমার রূপ সকল জীবে, সকল নরে প্রত্যক্ষ করিয়া তোমার বাণী শুনিয়া নিত্য বৃন্দাবনে বাস করিব। আমাকে তুমি একাগ্র কর, একান্তী কর, অনন্যচিত্ত কর, তন্ময় কর।

রুদ্রমূর্ত্তিতেও তুমি সুন্দর ও মধুর।

২৭শে জানুয়ারী, ১৯৩৩।

তুমি সুন্দর, আমাকে তোমার মনোহরণ রূপে মুগ্ধ করিয়াছ। তোমার মাধুর্য্য উপভোগ করার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি। তোমার সৌন্দর্য্য আমাকে সংসারের সকল কুৎসিৎ চিন্তা হইতে, নীচভাব হইতে, অসত্য বাক্য হইতে, অশুভ কর্ম্ম হইতে রক্ষা করুক। তোমার বজ্রকঠোর দণ্ড নিয়া যখন আস, রুদ্রমূর্ত্তিতে যখন আমার পাপ-রিপু সংহার করিবার জন্য আস, যখন তোমার ভয়ে কম্পিত হইতে হয়, যখন বিপদের অন্ধকারে নিজকে অসহায় মনে হয়, তখনও তুমি সুন্দর, তখনও তুমি মধুর, তখনও তোমার মঙ্গলবাণী শুনিয়া, মঙ্গলরূপ দেখিয়া ধন্য হই।

Opinion of Principal J. Barouah (retired) of the Earle Law College, Gauhati on the first three books of Mr. S. C. Roy,— extracted from his letter dated, 21. 12. 40.

My dear Principal Roy,

How very kind of you to send me the three little priceless books ("ছেলেমেয়েদের প্রার্থনা", "উৎসবের প্রণতি", "জীবন-বীণার বিচিত্রসুর"). I was so happy to receive them. I thank you most cordially for these gifts. I apologise for this long delay in acknowledging them. Pardon me. For the first book I have been longing for more than twenty years and therefore its appearance has made me very happy. And your reference to me has overwhelmed me. A book like this has been long overdue and its production from your facile pen has filled a very wide gap in Bengali literature. You have not only filled the gap, you have enriched the litura-ture. . I hope this will help others of your frame of mind to produce more books of this description so that our rising genera-tions may be God-minded.

Our education is very sadly neglected in this direction. Yours is a non-sectarian book and I hope all schools (irrespective of their sects or religion) will take up this book, if not as a religious book, as a "Rapid reading book". If the educational authorities do not consider this book equal to the standard I have given it, all that I can say is that I pity them. I wish that all our growing children should be religious-minded. The word "Religion" is a bugbear now-a-days, but if your children are caught young (and your book will catch them young) our children are bound to respect religion.

I am grateful, really grateful for this book.

Your "উৎসবের প্রণতি," is also a great friend for me. I am happy to receive it and am proud to possess it. "জীবন-বীণার [illegible]" has taken me back to my old days in London. I wish I had a book of this kind with [illegible] when I reached London in my early [illegible].

*　　*　　*　　*

Yours very sincerely,

Sd. J. Barooah.